বাংলা

মৌখিক

১ম ও ২য় পত্র - নবম শ্রেণীর জন্যে



এম. এল. দে এণ্ড কোং

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ১৯৭৪ সালের নূতন সিলেবাস অনুযায়ী নবম শ্রেণীর বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের জন্য লিখিত বাংলা মৌখিক।

বাংলা মৌখিক

(প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র)

নবম শ্রেণীর জন্য

নবম শ্রেণীর বাংলা ১ম ও ২য় পত্রে বাংলা মৌখিকের জন্য ২০ নম্বর করিয়া মোট ৪০ নম্বর ধার্য আছে।

সিলেবাস ঃ—আবৃত্তি, পাঠ, নাট্যাংশ পঠন, বিতর্ক, আলোচনা, কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তর।

১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত

এম, এল, দে এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীকালাচাঁদ দে
১৩/১, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীদুর্গাদাস পাণ্ডা এম. এ. বি. টি.
দেবাশীষ প্রেস
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রকাশিত নতুন পাঠ্যসূচীতে প্রতিবিষয়ে একশো নম্বরের মধ্যে কিছু নম্বর আবশ্যিক ভাবে নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। বাংলার প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্রেও বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী চল্লিশ নম্বর নির্দিষ্ট আছে। মৌখিক পরীক্ষার অন্তর্গত রয়েছে আবৃত্তি, নাট্যাংশ পাঠ, গদ্যাংশ পাঠ, বিতর্ক, আলোচনা, কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর। চূড়ান্ত পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন বোর্ড নিযুক্ত প্রশ্নকর্তারা।

মৌখিক বাংলায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ ছাড়া কোন বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত পাঠ্যতালিকা সামনে না থাকায় এই ধরণের গ্রন্থ প্রণয়নে লেখকদের স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের সস্নেহ পরামর্শে এই বিষয়ে পরে নির্দেশ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সেই দিক থেকে আমাদের প্রকাশিত 'বাংলা মৌখিক' এই বিষয়ের পথ প্রদর্শকের দাবী করতে পারে।

এই গ্রন্থ প্রণয়ণে আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক **কমল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী।**

আশা করি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়গণ আমাদের গ্রন্থটি সম্বন্ধে তাঁহাদের মূল্যবান অভিমত জানাবেন এবং কোন ত্রুটি থাকলে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যাতে পরবর্তী সংস্করণ আরো উন্নত মানের এবং সুন্দর করে প্রকাশ করবার সুযোগ আমরা পাই।

সূচীপত্র

এক

॥ বিতর্ক ॥

ভূমিকা ঃ—গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু। তিনি শিক্ষা দিতেন এক অভিনব পদ্ধতিতে। তিনি প্রশ্ন করতেন, শিক্ষার্থী দিত তার জবাব। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এক সময় সঠিক অবস্থায় পৌছতো শিক্ষার্থী, উপনীত হতো সত্যে। এইভাবে বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমরা পারি সত্যে উপনীত হতে। কারণ, আলাপ-আলোচনায়, যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগে কেবল সত্যের রূপ ধরা পড়তে পারে।

বিতর্ক কথার অর্থ বিশেষ তর্ক; অর্থাৎ যে তর্কের বিশিষ্ট রূপ আছে। যে তর্ক কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, যাহার গতি সুশৃঙ্খল এবং যাহার একটি সুষ্ঠু পরিণতি আছে তাহাকে আমরা বিতর্ক বলি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে 'তর্ক' কি? কোন মত বা মতবাদকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা নাকচ করার নাম 'তর্ক'। যেহেতু 'তর্ক' সম্পূর্ণরূপে যুক্তিনির্ভর এবং যুক্তি দ্বারা পরিচালিত তাই ইহাকে তর্ক-বিজ্ঞানও বলা হয়।

সহজ কথায় বিতর্ক বলিতে আমরা কি বুঝি? কোন একটি মত বা মতবাদ বা বক্তব্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে তর্কালোচনা; অর্থাৎ সেই মতের পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে তা উপস্থিত করা এবং বিপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে তাও উপস্থিত করা। অতঃপর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন্ পক্ষ সঠিক সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এটাই বিতর্কের সহজ রূপ।

ধরো তোমাদের বিদ্যালয়ে একটি বিতর্ক সভা হয়েছে। বিতর্কের বিষয়বস্তু, "সভার মতে দশম-শ্রেণী পাঠক্রম ব্যবস্থা (স্কুল-ফাইনাল), একাদশ-শ্রেণী পাঠক্রম ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল।" স্থির হলো ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন এই মতের পক্ষে এবং পাঁচজন এই মতের বিপক্ষে বলবে। সভার একজন শিক্ষক মহাশয় এই সভার অধ্যক্ষ হবেন। তাছাড়া কয়েকজন শিক্ষক মহাশয় বিচারক হিসাবে থাকবেন। যে পাঁচজন ছাত্র মতের পক্ষে বক্তব্য রাখবে তাদের একজন নেতা নির্বাচিত হবে এবং তাকে সভার নেতা বলা হয়। এই নেতা-ছাত্রটি প্রথমে তার বক্তব্য রাখবে। নেতা হিসাবে সে কিছু বেশী সময় পাবে। যেমন, অন্যান্য ছাত্র-বক্তারা যদি সাত মিনিট সময় পায় তবে নেতা দশ মিনিট সময় পাবে। উপরন্তু সকল বক্তার পরে এই নেতার উত্তর দেবার অধিকার থাকে।

অনুরূপভাবে বিপক্ষ অর্থাৎ বিরোধীপক্ষের ছাত্রদলেরও একজন নেতা নির্বাচিত হয়। এই নেতাও অন্যান্য ছাত্রদের অপেক্ষা বেশী সময় পাবে। তবে তার উত্তর দেবার কোন অধিকার থাকে না।

অধ্যক্ষ সভার কার্য্য পরিচালনা করবেন। তিনি প্রথমে সভার নেতাকে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করবেন। তার বক্তব্যের পর বিরোধী পক্ষের নেতা বক্তব্য রাখবে। অতঃপর একে একে সকল বক্তাই নিজ বক্তব্য রাখবার সময় পূর্ব্ববর্তী বক্তার যুক্তিগুলি খণ্ডন করে নিজ বক্তব্যকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবে। এইরূপে পক্ষের ও বিপক্ষের বক্তারা নিজ নিজ বক্তব্য রাখবে। বিতর্ক সভায় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্য পালনীয় :

(১) নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘন করা চলবে না।
(২) প্রস্তাবনার বাইরে কোন বক্তব্য রাখা চলবে না।
(৩) কোন বক্তা অপর বক্তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করবে না।
(৪) একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি চলবে না।
(৫) বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিনির্ভর হতে হবে।
(৬) বক্তা সব সময় সভার অধ্যক্ষকে সম্ভাষণ করে বক্তব্য রাখবে।
(৭) অধ্যক্ষের নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

সকল বক্তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অধ্যক্ষ নিজ ভাষণে প্রস্তাবনার পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি সংক্ষিপ্তাকারে সভায় উপস্থিত করবেন এবং উপস্থিত সদস্যদের মতামত গ্রহণ করবেন। যে পক্ষে অধিকাংশ সদস্য মত দেবেন, সেই পক্ষই জয়ী হবে।

প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক সভায় অধ্যক্ষ বিচারকমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রেষ্ঠ বক্তার নাম ঘোষণা করেন। সভার সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন যে বক্তা নিজ বক্তব্য সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে উপস্থিত করবে—সে মতের পক্ষেই বলুক বা বিপক্ষেই বলুক—তাকেই শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে ঘোষণা করা হয়।

উদাহরণ :—

প্রস্তাবনা—সভার মতে দশম শ্রেণীপাঠক্রম ব্যবস্থা একাদশ শ্রেণী পাঠক্রম ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল।

পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তি আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হয়।

পক্ষের যুক্তিসমূহ :—

(১) দশম-শ্রেণীপাঠক্রমের একটা ধারাবাহিকতা আছে যা একাদশ শ্রেণী পাঠক্রমে নেই।

(ক) যেমন একাদশ শ্রেণী পাঠক্রমে কোর গণিত ও ঐচ্ছিক গণিত একসঙ্গে

পড়তে হয়। কিন্তু নিয়মানুষযায়ী কোর গণিত শেষ করে ঐচ্ছিক গণিত করতে হয়। ফলে অসুবিধা হয়।

(খ) অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও বক্তব্য রাখা যায়।

(২) একাদশ শ্রেণী পাঠক্রমে ছাত্রদের উপর পাঠের চাপ খুব বেশী।

(৩) অষ্টম শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্র অর্থাৎ, সবে যে নবম শ্রেণীতে উঠেছে তার পক্ষে Stream ঠিক করা খুবই শক্ত।

(৪) পাঠক্রম অনুযায়ী ভাল বইয়ের অভাব।

বিপক্ষের যুক্তিসমূহ :—

(১) আমরা যে পাশ্চাত্য দেশ অর্থাৎ ইংলণ্ডের শিক্ষাক্রম অনুসারে এদেশের শিক্ষাক্রম রচনা করেছি সে দেশে একাদশ শ্রেণী পাঠক্রম ব্যবস্থা প্রচলিত।

(২) নবম শ্রেণী থেকে বিশেষ পাঠক্রম (বিজ্ঞান অথবা সাহিত্য অথবা টেকনিকাল) অনুসরণ করলে ভিত পাকা হয় এবং উচ্চশিক্ষার পক্ষে সুবিধা হয়।

(৩) একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি ডাক্তারী বা এঞ্জিনিয়ারীং পড়তে যাওয়া যায়।

(৪) বর্তমানে মাতৃভাষায় যথেষ্ট ভাল বই লেখা হচ্ছে ইত্যাদি।

উপকারিতা :—বিতর্ক সভার মাধ্যমে ছাত্ররা গুছিয়ে কথা বলতে শেখে। তাদের চিন্তাধারা সুশৃঙ্খল হয়। বিতর্কমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া যায়। যেহেতু যুক্তিই বিতর্কের প্রাণ, বিতর্ক সভা ছাত্রদের যুক্তিপরায়ণ, ভদ্র, বিবেচক এবং সংযমী হতে শিক্ষা দেয়। ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

বিতর্কে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের প্রতি :—

তোমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই বিতর্কে অংশ গ্রহণ একটি নূতন ঘটনা। ফলে প্রথম প্রথম বক্তৃতার সময় ভয় করবে, গলা কাঁপবে, পা কাঁপবে, কথা আটকে যাবে। কিন্তু এতে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। এরকম ঘটনা সকলের জীবনেই ঘটে থাকে। অভ্যাসের ফলে ধীরে ধীরে এই ভয় কেটে যাবে। নতুন অবস্থায় কতকগুলি কাজ করতে পার। বিতর্কের বিষয়বস্তুর উপর নিজ বক্তব্য গুছিয়ে লিখে ফেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়ি ধরে সেই বক্তব্য বার বার বলার অভ্যাস কর। যদি সাত মিনিট সময় থাকে, তবে পাঁচ মিনিট নিজের বক্তব্যের জন্য রাখ ; বাকী দু মিনিট প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করবার জন্য রাখ। এই পদ্ধতিতে অনুশীলন করলে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

বিতর্ক সভার একটি চিত্র ঃ—

প্রস্তাবনা ঃ সভার মতে পল্লীজীবন নাগরিক জীবন অপেক্ষা শত-গুণে শ্রেয়ঃ।

সভা আরম্ভ হল। সভার অধ্যক্ষ প্রস্তাবনার পক্ষে প্রথম বক্তা অর্থাৎ নেতাকে বক্তব্য রাখতে বললেন।

প্রথম বক্তা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আজ বক্তব্য রাখতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই অমর বাণীর কথা মনে পড়ছে।

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ, লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি······

কেন মহাকবির এই খেদোক্তি! নগরজীবনের প্রতি, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ মহাকবি নগরজীবনের কোলাহল থেকে বহুদূরে বীরভূমের অখ্যাত পল্লী বোলপুরে প্রতিষ্ঠা করলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম। নতুনতর শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করলেন নিজের হাতে। প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের আদর্শে স্থাপন করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। কেন মহাকবির এই প্রচেষ্টা? নগরজীবনের সঙ্গে তাঁর সুগভীর সম্পর্ক ছিল—দেখেছিলেন নগরজীবনের কলুষতা, কৃত্রিমতা—তাই বোধকরি ইটের পরে ইটের মাঝে তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল। তাই ফিরে যেতে চেয়েছিলেন সেই আদর্শ পল্লীজীবনে যেখানে পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গে—যেখানে সবুজের সমারোহ চোখ জুড়িয়ে দেয়। যেখানে যন্ত্রের কোলাহল ধ্যান ভঙ্গ করে না—যেখানে কলুষতা নেই—কৃত্রিমতা নেই—আছে সহজ, সুন্দর, সরল, স্বচ্ছন্দ গতিময় জীবন।

ভারতের জননায়ক মহাত্মা গান্ধীরও সেই বাণী—'ফিরে চলো গ্রামে।'

কেন, কেন শ্রেষ্ঠব্যক্তিদের এই অভিমত?

কারণ খুবই স্পষ্ট। নগরজীবন বা নগরসভ্যতা যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। এই যন্ত্র মানুষের প্রাণের রস ধীরে ধীরে নিংড়ে নিচ্ছে। ভাবুন তো আজ আমাদের অভিভাবকদের কথা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কোন অবসর নেই। এই বাজার, দোকান, রেশন ইত্যাদি সেরে কোনমতে স্নান করে মুখে কিছু খাদ্য গুঁজে ছুট, ছুট, কর্মস্থলের দিকে। যাওয়ার সময় যানবাহনের ভীড়,—যাই হোক কোনক্রমে কর্মস্থলে পৌঁছে ঘাড় গুঁজে আট-দশ ঘণ্টা কাজের পর যখন বাড়ী পৌঁছলেন তখন আর কিছু করার নেই। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ। তা সত্বেও কিছু কাজ, কিছু পারিবারিক সমস্যা আছে। সেগুলো

মিটিয়ে খেয়ে দেয়ে যখন শুতে গেলেন তখন হয়তো রাত্রি এগারটা। এইতো জীবন। একঘেঁয়ে, বৈচিত্র্যহীন যান্ত্রিক জীবন। তার ওপর আছে আরও নানাবিধ সমস্যা। সন্ধ্যে হলে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে যাচ্ছে। চোখ জ্বালা করে, ভাল করে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। আবহাওয়া দূষিত। পানীয় জল দূষিত। বৃষ্টি হলে জল জমে একাকার। ঘুম থেকে উঠলে চোখ আটকে গেল পাশের দেওয়ালে। দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় না ফলে চোখের অসুখ, দৃষ্টিহীনতা। সর্বোপরি নগরজীবনের কলুষতা তো আছেই। আর কত বলব ? এককথায় এটুকু বলা যায় যে এই নগরজীবনের চেয়ে পল্লীজীবন শতগুণে ভাল।

সভার অধ্যক্ষ এইবার **বিরোধী পক্ষের** নেতাকে বক্তব্য রাখতে বললেন।

বিরোধী পক্ষের নেতা :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

এইমাত্র সম্মানিত সদস্যের যে বক্তৃতা শুনলাম তার প্রশংসা করতে পারতাম যদি সেই সুন্দর বক্তৃতা যুক্তিনির্ভর হত। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হল যে আমরা তিনশো বছর পিছিয়ে গিয়েছি। যখন বারাণসীধামে বেড়াতে যেতে হলে সকলের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে রওনা হতে হত। কারণ জীবিতাবস্থায় ফেরার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যখন জীবন খুব সীমাবদ্ধ ছিল—গণ্ডী ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ।

সম্মানিত সদস্য আমাদের মহাকবির বাণী শুনিয়েছেন, মহাত্মার বাণী শুনিয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে তাঁরা আদর্শ নগরজীবনের বিরোধী ছিলেন। নগর-জীবনকে তাঁরা ধিক্কার জানিয়েছেন তাকে সুন্দর করার জন্য, আদর্শে পরিণত করার জন্য। কারণ তাঁরাও জানতেন সভ্যতার অগ্রগতির সাথে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল রেখে চলতে হলে পল্লীজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাই পল্লীতেও যান্ত্রিক সভ্যতার অবদান তাঁদের কাম্য ছিল।

আজ দ্রুতগতিতে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। সেই গতির সঞ্চার ঘটেছে জীবনে। অতএব ধীর শান্ত সমাহিত জীবনের অবকাশ নেই। বিজ্ঞানী তার গবেষণাগারে নিরলস সাধনায় ব্যস্ত, শিল্পী শিল্পের সাধনায় ব্যস্ত, বাস্তুকার নব নব যন্ত্র, প্রাসাদ নির্মাণে ব্যস্ত।

আজ ঘুম থেকে উঠে খবরকাগজের মাধ্যমে দুনিয়ার খবর পাচ্ছি। কোথায় থাকত এই সুযোগ যদি না যন্ত্র আসত। গরমে পাখা, শীতে গরম, অন্ধকারে বিদ্যুতের আলো, আরাম ছাড়াও কাজের সুবিধা কত। ট্রেণ, মোটর, এরোপ্লেন—তাড়াতাড়ি যাতায়াতের কত সুবিধা। ফলে সময় বেঁচেছে, কাজের সুযোগ বেড়েছে। অতএব নগরজীবন, যান্ত্রিক সভ্যতাকে দোষারোপ করে লাভ নেই।

সম্মানিত সদস্য কেবল নিন্দাই করলেন। কিন্তু নগরজীবনের যে খারাপ দিক তা দূর করা কিছু কঠিন নয়। পরিকল্পনামত আধুনিক যে সমস্ত শহর-নগর গড়ে উঠছে যেখানে সম্মানিত সদস্যের উল্লিখিত ত্রুটিগুলি অনুপস্থিত, সেখানে সবুজও আছে; ধোঁয়া নেই। কলকাতার মত যে সমস্ত শহর নিজ প্রয়োজনে আপনা আপনি গড়ে উঠেছে—যেখানে পূর্বপরিকল্পিত কিছু ছিল না—সেখানকার জীবনকে নগরজীবনের আদর্শ ধরলে চলবে না। আজ কলকাতাকেও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, নতুন করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও কাজ চলছে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে ব্যস্ততা, কোলাহল জীবনের গতির লক্ষ্য। উদ্দামতা, উচ্ছলতাই জীবনের গতি, যৌবনের গতি। মহাকবির বাণী উদ্ধৃত করে আবার বলি।

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

দাঁড়াবার, থামবার অবকাশ নেই। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

এরপর আবার প্রস্তাবনার পক্ষে যে বলবে সে পূর্ববর্তী বক্তার যুক্তি খণ্ডন করে নিজ বক্তব্য রাখবে। এইভাবে বিতর্ক সভা পরিচালিত হয়।

অনুশীলনী

(১) ছাত্রজীবনে রাজনীতির কোন স্থান নাই।

পক্ষের যুক্তি ঃ

(ক) ছাত্রজীবনে অধ্যয়ন করাই একমাত্র কাজ;

(খ) রাজনীতি পড়াশুনার ক্ষতি করে। মনঃ সংযোগে বিঘ্ন ঘটায়।

(গ) মানসিক পরিপূর্ণতা (maturity) ছাত্র জীবনেই অর্জিত হয়। এই পরিপূর্ণতা না থাকলে রাজনীতি করা যায় না।

(ঘ) শৈশব ও কৈশোর ছাত্রজীবনের অধিকাংশ কাল। এই সময় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য কোন আকর্ষণ পাঠের পক্ষে ক্ষতিকর ইত্যাদি।

বিপক্ষের যুক্তি ঃ

(ক) অধ্যয়ন ছাত্রজীবনের প্রধান কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু অধ্যয়নের একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য কিছু বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে, যেমন, খেলাধূলা। অতএব, রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষতি করে না বরং এর সহায়ক।

(খ) ছাত্ররাই ভবিষ্যৎ নাগরিক, এই উক্তি যদি সত্য হয় তাহ'লে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা চাই।

(গ) মানসিক পরিপূর্ণতার সাথে সাথে রাজনৈতিক পরিপূর্ণতাও ঘটে। অতএব একে অপরের পরিপূরক।

(ঘ) রাজনীতি কোন বাইরের আকর্ষণ নয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনার পর্যালোচনা এবং প্রতিফলনই রাজনীতি। অতএব ছাত্রদের জীবনেও রাজনীতির প্রভাব পড়বেই। ইত্যাদি।

(২) বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানব জীবনে অভিশাপ বহন করে এনেছে :—

পক্ষের যুক্তি :—

(ক) বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নতুন নতুন মারণাস্ত্র তৈরী করতে সাহায্য করেছে—ফলে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে।

(খ) বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলেই আজ খাদ্যে, ঔষধে ভেজাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

(গ) বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে যে যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে তা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ইত্যাদি।

বিপক্ষের যুক্তি :—

(ক) বিজ্ঞানের আবিষ্কার শুধু মারণাস্ত্র করে নি। আজ পেনিসিলিন, ষ্টেপটোমাইসিন কোটি কোটি লোকের প্রাণ বাঁচাচ্ছে।

(খ) খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে মানুষ—বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে অপকার্যে লাগাচ্ছে যে মানুষ সে ধিক্কারের যোগ্য। এর জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়।

(গ) আরামপ্রিয় মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করে না তাই তার স্বাস্থ্যহানি হয়। এর জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করা চলে না ইত্যাদি।

(৩) চলচ্চিত্র সমাজ-জীবনে কুফল বিস্তার করে :

পক্ষের যুক্তি :

(ক) আধুনিক চলচ্চিত্র প্রযোজকেরা মুনাফার লোভে চলচ্চিত্র উৎপাদন করেন। ফলে দর্শকদের আকৃষ্ট করবার উপাদানে ভর্তি যথা—খুন-রাহাজানি, বিকৃত রুচিসম্পন্ন দৃশ্য, উত্তেজক হীন প্রবৃত্তিমূলক দৃশ্য প্রভৃতির ওপর জোর দেন প্রযোজক।

(খ) বাস্তব জীবন ও আদর্শ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

(গ) যেহেতু চলচ্চিত্র অপরিণত ও কিশোর বয়স্কের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে—তাই আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে উহার প্রভাবে কিশোরদের মধ্যে সামাজিক অপরাধ করার প্রবণতা কি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইত্যাদি—

বিপক্ষের যুক্তি :

(ক) চলচ্চিত্র প্রযোজকের অপরাধের জন্য চলচ্চিত্র দায়ী নয়।

(খ) শিক্ষার মাধ্যম ও বাহন হিসাবে চলচ্চিত্রের সার্থক ব্যবহার খুবই উপযোগী।

(গ) কর্মক্লান্ত জীবনে চিত্তবিনোদনের সুলভ উপায় ইত্যাদি।

(৪) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষা আজও অপরিহার্যঃ

পক্ষের যুক্তি ঃ—

(ক) দুশো বছরের ইংরেজ শাসন নিজ স্বার্থে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেছিল। দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই আজ ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষার কথা ভাবা যায় না।

(খ) উচ্চ-শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় বিশেষ কোন পুস্তক আজও রচিত হয় নি। ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তক পড়তে হয়।

(গ) মাতৃভাষা ছাড়াও যে কোন একটি উন্নত দেশের ভাষা অবশ্যই শিক্ষণীয়। সেদিক দিয়েও ইংরেজী ভাষা গ্রহণই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ইত্যাদি—

বিপক্ষের যুক্তি ঃ—

(ক) ইংরেজী ভাষা অপরিহার্য এটা দাস মনোবৃত্তির কথা। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

(খ) একটি বিদেশী ভাষা যথা—ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে কত সময় ব্যয় হয়—তাবা আয়ত্ত করবার পর শিক্ষা আহরণ—কত শক্তি ও সময়ের অপব্যয়।

(গ) আজ মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার জন্য বই লেখা হচ্ছে—সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সরকারের সহযোগিতায় উচ্চতম মানের পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্ভব—ইংরেজী ভাষা—দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে চলতে পারে। ইত্যাদি—

(৫) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিতর্ক অভ্যাস করবেঃ

(ক) সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের মূল্য অনেক বেশী।

(খ) শিক্ষা বৃত্তিমূলক হওয়া উচিত।

(গ) ধর্মঘট কোন সমস্যার সমাধান করে না।

(ঘ) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাই শ্রেষ্ঠ।

(ঙ) বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ইহা আরব্ধ জ্ঞানের সঠিক বিচার করে না।

(চ) কলকাতা থেকে রিক্সা, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি ধীরগতিসম্পন্ন যানবাহন তুলে দিতে হবে।

(ছ) আমাদের সমাজে ধনী-ব্যক্তিরাই উচ্চতর আসন লাভ করেন।

(জ) পরীক্ষায় পাশ করার সহিত শিক্ষার—জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। ইহা চাকুরী সংগ্রহের একটি উপায় মাত্র।

(ঝ) বর্তমান মাধ্যমিক পাঠক্রমে সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

(ঞ) বর্তমানে সার্বজনীন পুজায়, পূজাটা গৌণ ; আড়ম্বরটাই মুখ্য।

দুই

॥ নাট্যাংশ ॥

জীবনের বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতি সাহিত্যে ধরা পড়ে। নাটকও জীবনের প্রতিরূপ; যে জীবন গতিশীল ও পরিবর্তনশীল, নাটকে তারই প্রকাশ।

সব নাটকের মূল লক্ষ্য দর্শকের আগ্রহ এবং কৌতূহল ধরে রাখা। এর জন্য প্রয়োজন গতি বা action! এই গতির আসল স্থান দর্শকের মনোজগৎ।

নাটকে গতিবেগ সৃষ্টির একটি অপরিহার্য উপাদান সংঘাত। সংঘাতের অস্তিত্ব না থাকলে নাটক জমানো সত্যিই কঠিন। এই সংঘাত নানা ধরনের হতে পারে। যেমন, অদৃশ্য দৈব-শক্তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ, সমাজ-শক্তির সঙ্গে ব্যক্তি-শক্তির দ্বন্দ্ব। আবার এই দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্য-বোধের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, সমাজ চেতনার সঙ্গে ব্যক্তি-চেতনার অর্থাৎ চরিত্রের অভ্যন্তরে নিহিত সংঘাতও হতে পারে।

নাটকের গতিবেগ সৃষ্টির আর একটি কৌশল নাট্যোৎকণ্ঠা বা সাসপেন্স। যদিও সাসপেন্স দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, কারণ তীব্র উত্তেজনা বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। তবুও এই সাসপেন্সই নাটককে এগিয়ে নিয়ে যায়। এরই ফলে দর্শক উত্তেজিত আগ্রহ নিয়ে নাট্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

নাটকে সংলাপের গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ, নাটকের কাহিনী-ও চরিত্রসৃষ্টির প্রধান উপায় হল সংলাপ। সংলাপের ভাষা শুধু ভাবপ্রকাশক নয়, গতিসঞ্চারী। সংলাপ যেমন স্বাভাবিক হবে, তেমনি নাটকীয়ও হবে। বাক্যের হ্রস্বতা ও ক্ষিপ্রতা নাটকীয় সংলাপের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কারণ, সংলাপের বাক্য দীর্ঘ ও জটিল হলে বাক্যের গতি হয়ে পড়ে বিলম্বিত।

বিষয়ারম্ভ এবং রস অনুযায়ী নাটকের সংলাপ কখনও পদ্য এবং কখনও বা গদ্যরীতি অবলম্বন করতে পারে।

॥ এক ॥

কয়েকটি উদাহরণ :—

[উদ্ধৃতাংশে সিরাজদ্দৌলার অন্তর্দ্বন্দ্ব, মীরমদনের দৃঢ়তা, করিম চাচার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সিরাজদ্দৌলার উক্তিতে বাঙালী তথা ভারতবাসীদের অনৈক্য, দেশাত্মবোধের অভাব এবং চারিত্রিক দৌর্বল্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।]

সিরাজ। মীরমদন, কি হবে! কোথা যাবো?

মীরমদন। জনাব, কোন শঙ্কা নেই। ইংরাজ সৈন্য বিমুখ হয়েছে, ওই আমাদের তোপধ্বনি। এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই ইংরাজের পশ্চাৎ গিয়ে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করি। আজই ইংরাজ ধ্বংস হবে।

সিরাজ। না, মীরমদন, যেও না। ইংরাজ ধ্বংসে আমার প্রয়োজন নাই। এই নবাবী—এই সুখের আশায় উন্মত্ত হয়েছিলেম! দিবারাত্র কণ্টক শয্যায় শোবার জন্য নবাবী গ্রহণ করেছিলেম!

মীরমদন। জনাব, জনাব, অমন করছেন কেন? অনেক দুর্গম রণে নির্ভয় অন্তরে সৈন্য সঞ্চালন করেছেন। ইংরাজ পরাস্ত; ঐ শুনুন, বিপক্ষের তোপধ্বনি নাই। মুহুর্মুহুঃ আমাদেরই কামান গর্জন হচ্ছে! একটু স্থির হোন, আমি সমূলে ইংরাজ উচ্ছেদ করি।

সিরাজ। মীরমদন, মীরমদন, আমি ভীরু নই। দুর্গম রণসঙ্কটে আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে দেখেছ। কিন্তু ফিরিঙ্গি নামে আমার দেহ কম্পিত হয়। সহস্র সহস্র তোপধ্বনির মধ্যে যদি একটি ইংরাজের তোপের শব্দ হয়, আমি তা বুঝতে পারি; সে শব্দে আমার আপাদমস্তক কম্পিত হয়। দৈত্য, দানব, প্রেত, ভূত স্বদলে আমার সম্মুখে উপস্থিত হলে, আমি অসিহস্তে তাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ইংরাজ, কোন্ শয়তান বংশে জন্ম কে জানে, এরা কি যাদুকর? কোন্ কুহকবলে আমার বিপুল সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে সাহস করলে! ইংরাজ কুশলে থাকুক, ইংরাজ বলবান হোক, যারা আমার সিংহাসন ঈর্ষা করে, তারা আমার সেই সিংহাসনে বসুক, ইংরাজ তাদের শত্রু হোক, দিবারাত্র আমার ন্যায় কণ্টকাসনে উপবিষ্ট হয়ে ইংরাজ সম্মুখে দেখুক।

মীরমদন। জনাব, তুচ্ছ ফিরিঙ্গি জনাবের নফরের যোগ্য নয়। বর্বরতা বশতঃ আক্রমণ করেছিল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আক্রমণ করেছিল, নিরুপায় হয়ে আক্রমণ করেছিল—আজ্ঞা দিন হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ দর্শন করুন, মুহূর্ত মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম ধূলিসাৎ করবো। জনাব, আপনার এই দশা দেখে আমার মরতে ইচ্ছা হচ্ছে। প্রকৃতিস্থ হোন বঙ্গেশ্বর, আজ্ঞা দিন; স্বয়ং শয়তান স্বদলবলে ইংরাজের সাহায্য

করলে আজ নিস্তার পাবে না—কেবলমাত্র আজ্ঞা দিন, এই প্রার্থনা। জনাব প্রকৃতিস্থ হোন।

সিরাজ। মীরমদন, তুমি জান না, মোগলবংশ উচ্ছেদ করতে ইংরাজ জন্মগ্রহণ করেছে। শিখগুরু তেগ্‌বাহাদুরের অভিশাপ তুমি কি অবগত নও? শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে, মোগলবংশ উচ্ছেদ করবে। মহাপুরুষের অভিশাপ কখনও খণ্ডন হবে না। মোগলবংশ উচ্ছেদের জন্য ইংরাজ ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত।

(করিম চাচার প্রবেশ)

করিম। সূর্যোদয় হয়েছে, চাচারা বোধহয় বারানসী তুল্য গঙ্গার পশ্চিম পার হতে গঙ্গা দর্শন করে নবাব দর্শনে আসছেন। চাচারা কেঁদে এখনি লুটোপুটি খাবে, আমায় শান্ত করতে হবে। ঐ যে সব চোখ ডব্‌ডব্‌ করছে, কানা মেঘের জল কোথায় লাগে!'

(মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপ চাঁদের প্রবেশ)

সকলে। জগদীশ্বর রক্ষা করুন, এই যে নবাব!

রায়দুঃ। বড়ই ব্যাকুল হয়েছিলেম।

জগৎ। ভববান রক্ষা করেছেন।

করিম। এখন তো প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো। আমি রুমাল বাগিয়ে রেখেছিলুম, ভেবেছিলুম, চাচারা কাঁদবে, চোখ মোছাবে কে?

সিরাজ। রাজারায়দুর্লভ! এই দণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব করে ইংরাজ শিবিরে দূত প্রেরণ করুন। যে সর্তে ইংরাজ সন্ধি করতে প্রস্তুত, সেই সর্তে সন্ধি হোক।

মীরজাঃ। জনাব!

সিরাজ। আর জনাব নয়। কাল-রজনী প্রভাত হয়েছে—সূর্যোদয়ে প্রকৃতিস্থ হয়েছি। বুঝেছি ইংরাজ সামান্য নয়; এ অপেক্ষা শতগুণ সৈন্য লয়ে ইংরাজ পরাস্ত করা আমাদের সাধ্য নয়। এই দণ্ডেই সন্ধি হোক্। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করো, সন্ধিপত্র আমাদের নিকট প্রেরণ করো, আমরা স্বাক্ষর করবো। আর বলবীর্য প্রকাশে প্রয়োজন নাই! সূর্যোদয়ে যেমন গ্রহজ্যোতি নির্বাপিত হয়, ইংরাজ উদয়ে সেইরূপ ভারত-বীর্য নির্বাপিত! ভারত স্বাধীনতা ইংরাজের পদতলে। ঘোর নিশায় অচিরে ভারত আবরিত হবে। কালচক্র পরিবর্তনে কারো সাধ্য নাই। অদ্যই যেন সন্ধিপত্র আমার নিকট প্রেরিত হয়। যাও যাও, বিলম্ব করো না, এই দণ্ডেই দূত প্রেরণ করো। (অমাত্যগণের প্রস্থান)

মীরমঃ। হা জননী জন্মভূমি।

সিরাজ। মীরমদন, আক্ষেপ করো না, আক্ষেপে আর উপায় নাই। যে দিন ইংরাজের

জলতরী বাঙ্গলার বন্দরে উপস্থিত হয়েছে, সেই দিন আশা-ভরসা বিলুপ্ত। ভারতবাসী ভারতবাসীর যুদ্ধে ক্লান্ত! মহারাষ্ট্রীয়েরা বলীয়ান—ভারতবাসী! তাদের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলাজর্জ্জরীভূত;—তাদের দৌরাত্ম্যে ইংরাজের বলবৃদ্ধি।…ভারত বিচ্ছিন্ন! ভারতসন্তান পরস্পরের শত্রু! উদ্যমশীল, একতায় আবদ্ধ উদ্যোগী পুরুষ সিংহ—কার সাধ্য তাদের দমন করে!

মীরম:। জনাব, তুচ্ছ শত্রুর কেন প্রশংসা করছেন? বাঙ্গলায় কি বীর বীর্য বিলুপ্ত, আপনার সৈন্য কি অস্ত্রধারণে অক্ষম? বাঙ্গলার বীরত্ব শতরণে পরীক্ষিত; জনাব তবে কেন উৎসাহহীন হচ্ছেন? ক্রীতদাস এখনো জীবিত, এখনো সৈন্য সঞ্চালনে অক্ষম নয়, পিধানে অসি আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় বিচঞ্চল। ইষ্টক নির্মিত ফোর্ট উইলিয়ম বীরপ্রবাহ রোধ করতে সক্ষম হবে না। তবে কেন শত্রুর গৌরব বর্ধন করে সন্ধির প্রস্তাব করছেন? তবে কেন ইংরাজ অজেয় বিবেচনা করছেন? তবে কেন মাতৃভূমি, ফিরিঙ্গির ভয়ে ভীত প্রচার করছেন? তবে কেন জন্মভূমির পরাধীনতার আভাস প্রদান করছেন?

সিরাজ। না মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হয়ে সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত করে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব; নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য। মীরমদন, আক্ষেপ ত্যাগ করো। জেনো, বাঙ্গলায় সকলেই মীরমদন নয়।

(গিরিশচন্দ্র রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের অংশ বিশেষ)

॥ দুই ॥

[রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণগণ ক্ষুব্ধ। তাঁরা রাজকুমারীর নির্বাসন চান। তাঁদের নেতা ক্ষেমঙ্কর। ক্ষেমঙ্করের বন্ধু সুপ্রিয় এর বিরোধিতা করেছেন। ইতিমধ্যে উগ্রসেন এসে সংবাদ জানালেন, যে কোন মুহূর্তে সংঘর্ষের সূচনা হতে পারে। সেই সংকট ক্ষণে তাঁরা জগদ্ধাত্রীর স্তব-বন্দনা আরম্ভ করলেন এই বিশ্বাসে যে এইবার তিনিই নাস্তিকের সকল অহংকার বিচূর্ণ করবেন।

এমন সময় আকস্মিকভাবে আবির্ভূতা হয়েছেন রাজদুহিতা মালিনী।]

মন্দির প্রাঙ্গণে

ব্রাহ্মণগণ নির্বাসন, নির্বাসন রাজদুহিতার
নির্বাসন।

ক্ষেমঙ্কর
বিপ্রগণ, এই কথা সার।
এ সংকল্প দৃঢ় রেখো মনে। জেনো ভাই
অন্য অরি নাহি ডরি নারীরে ডরাই।
তার কাছে অস্ত্র যায় টুটে; পরাহত
তর্কযুক্তি, বাহুবল করে শির নত—
নিরাপদে হৃদয়ের মাঝে করে বাস
রাজ্ঞী সম মনোহর মহাসর্বনাশ।

চারুদত্ত
চলো সবে রাজদ্বারে, বলো, "রক্ষ রক্ষ
মহারাজ, আর্যধর্মে করিতেছে লক্ষ্য
তব নীড় হতে সর্প।"

সুপ্রিয়
ধর্ম? মহাশয়,
মূঢ়ে উপদেশ দেহ ধর্ম কারে কয়।
ধর্ম নির্দোষীর নির্বাসন?

চারুদত্ত
তুমি দেখি
কুলশত্রু বিভীষণ। সকল কাজে কি
বাধা দিতে আছে।

সোমাচার্য
মোরা ব্রাহ্মণ-সমাজে
একত্রে মিলেছি সবে ধর্মরক্ষাকাজে;
তুমি কোথা হতে এসে মাঝে দিলে দেখা
অতিশয় সুনিপুণ বিচ্ছেদের রেখা
সূক্ষ্ম সর্বনাশ।

সুপ্রিয়
ধর্মাধর্ম সত্যাসত্য
কে করে বিচার। আপন বিশ্বাসে মত্ত
করিয়াছ স্থির, শুধু দল বেঁধে সবে
সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চরবে?
যুক্তি কিছু নহে?

চারুদত্ত
দম্ভ তব অতিশয়
হে সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়
প্রিয়ংবদ, মোর দম্ভ নয়;
আমি অজ্ঞ অতি—দম্ভ তারি যে আজিকে
শতার্থক শাস্ত্র হতে দুটো কথা শিখে

নিষ্পাপ নিরপরাধ রাজকুমারীরে
টানিয়া আনিতে চাহে ঘরের বাহিরে
ভিক্ষুকের পথে,—তাঁর শাস্ত্রে মোর শাস্ত্রে
দু-অক্ষর প্রভেদ বলিয়া।

ক্ষেমঙ্কর বচনাস্ত্রে
কে পারে তোমারে বন্ধুবর।

সোমাচার্য দূর করে
দাও সুপ্রিয়েরে। বিপ্রগণ করো ওরে
সভার বাহির।

চারুদত্ত মোরা নির্বাসন চাহি
রাজকুমারীর। যার অভিমত নাহি
যাক সে বাহিরে।

ক্ষেমঙ্কর ক্ষান্ত হও বন্ধুগণ।

... ...

(উগ্রসেনের প্রবেশ)

উগ্রসেন কার্য সিদ্ধ ক্ষেমঙ্কর। হয়েছে চঞ্চল
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে রাজসৈন্যদল,
আজি বাঁধ ভাঙে ভাঙে।

সোমাচার্য সৈন্যদল!

চারুদত্ত সে কী।
একী কাণ্ড, ক্রমে এ যে বিপরীত দেখি
বিদ্রোহের মতো।

সোমাচার্য এতদূর ভালো নয়
ক্ষেমঙ্কর।

চারুদত্ত ধর্মবলে ব্রাহ্মণের জয়,
বাহুবলে নহে। যজ্ঞ যাগে সিদ্ধ হবে;
দ্বিগুণ উৎসাহভরে এসো বন্ধু সবে
করি মন্ত্র পাঠ। শুদ্ধাচারে যোগাসনে
ব্রহ্মতেজ করি উপার্জন। একমনে
পূজি ইষ্টদেবে।

... ...

ব্রাহ্মণগণ (সমস্বরে) সবে করজোড়ে যাচি—
আয় মা প্রলয়ঙ্করী।
(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী আমি আসিয়াছি।

(ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

সোমাচার্য এ কী দেবী, এ কী বেশ। দয়াময়ী এ যে
এসেছেন ম্লানবস্ত্রে নরকন্যা সেজে।
এ কী অপরূপ রূপ। এ কী স্নেহজ্যোতি
নেত্রযুগে। এ তো নহে সংহার-মূরতি।
কোথা হতে এলে মাতঃ। কী ভাবিয়া মনে,
কী করিতে কাজ ?

মালিনী আসিয়াছি নির্বাসনে,
তোমরা ডেকেছ বলে ওগো বিপ্রগণ।

[রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের অংশ]

॥ তিন ॥

[শরৎকালের ছুটির দিনের আনন্দোৎসবে যোগদান করবার জন্য যখন সকলে উন্মুখ, জীর্ণ ও নীরস পুঁথিপত্র ফেলে রেখে আনন্দগানে মুখরিত হবার উদ্যোগ করছে, তখন শুধু উপনন্দ প্রভুর ঋণশোধের জন্য পুঁথি লিখে চলেছে, তার বুঝি ছুটি নেই।]

বেতসিনীর তীরবন
ঠাকুরদাদা ও বালকগণ
সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

বালকগণ। সন্ন্যাসীঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে ? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই, আপনি কে ?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী। হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ! আমাকেও একটু পায়ের ধূলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি—আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ!

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর, ঠাকুরদাদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কত দিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী। খুব অল্প দিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই—এলেন ব'লে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশায়!

প্রথম বালক। সন্ন্যাসীঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুথির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এসো ভাই! আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে তুমি হবে সর্দার-চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ! ভারী তো কাজ!—ঠাকুর তুমি ওকে বলো-না! ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ? আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া) আজ ছুটির দিন। কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই ?

উপনন্দ। ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়াছেন, তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী—সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব। [রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' নাটকের অংশ]

॥ চার ॥

[শেক্সপীয়রের 'ম্যাকৃবেথ' নাটকের উদ্ধৃতাংশে লেডী ম্যাকবেথের প্ররোচনায় এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ প্রয়াসী ম্যাকবেথের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রতিরূপের পরিচয় পাই।]

(লেডী ম্যাকৃবেথের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্। যে মদিরা উন্মত্ত করেছে সবে—
করিয়াছে সাহস প্রদান মোরে ;
জ্ঞান-জ্যোতি নির্বাণ সবার যে প্রভাবে—
উদ্দীপিত করেছে আমায়।
একি ! না পেচক ফুৎকার,
ভয়ঙ্কর রজনীর ঘণ্টা-নিনাদক,
কঠিন আরাবে দেয় বিদায় সবায়।
এতক্ষণ নিয়োগ হয়েছে বুঝি কাজে,
উদ্ঘাটিত দ্বার, মদমত্ত ভৃত্যগণে,
নিজকার্য করে উপহাস—
নাসিকার ধ্বনি করি ;
পানপাত্রে করিয়াছি ঔষধ প্রদান,
যাহে প্রকৃতির সনে, মৃত্যু করে বাদ—
জীবিত কি মৃত বলি

নেপথ্যে ম্যাকৃবেথ। কে ও ? কি, আঁ !

লেডী-ম্যাক্। বুঝি সর্বনাশ হয়, কাঁপিছে হৃদয়,
জেগেছে সকলে, কার্য নহে সমাধান।
উদ্যম বিফল, কার্য নাশ, মজাইল—মজাইল।
একি !
কোষমুক্ত করি রাখিয়াছি রক্ষকের অসি

ভ্রম নাহি হ'বে দেখে নিতে।
আকারে না হ'ত যদি পিতার সমান,
আমি সাধিতাম কাজ ;—

(ম্যাকৃবেথের প্রবেশ)

স্বামী মম।

ম্যাক্‌বেথ। করিয়াছি কার্য সমাধান,
শুনেছ কি কিছু ?

লেডী-ম্যাক্। মাত্র পেচকের নাদ, আর ঝিল্লীর ঝঙ্কার
কয়েছিল কোন কথা ?

ম্যাক্‌বেথ। কখন ?

লেডী-ম্যাক্। এখন।

ম্যাক্‌বেথ। নামিতে নামিতে ?

লেডী-ম্যাক্। হাঁ।

ম্যাক্‌বেথ। শুন, দ্বিতীয় কক্ষেতে কেবা ?

লেডী-ম্যাক্। ডনাল্‌বেন।

ম্যাক্‌বেথ। (হস্ত দেখিয়া) দৃশ্য অতি দুঃখকর!

লেডী-ম্যাক। পাগলের কথা,—দুঃখকর।

ম্যাক্‌বেথ। নিদ্রাঘোরে জনেক হাসিল,
জনেক কহিল—'হত্যা'
জাগাইল পরস্পরে ;
শুনিলাম দাঁড়ায়ে সে সব—
প্রার্থনা করিয়া পুনঃ নিদ্রা গেল সবে।

লেডী-ম্যাক্। এক কক্ষে আছে দুইজন।

ম্যাকবেথ। জনেক কহিল,—'রক্ষা কর ভগবান!'
'শান্তি শান্তি', জনেক কহিল,
হত্যাকারী হস্ত যেন দেখিল আমার।
শুনিয়া সভয় উক্তি সে সবার,
নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
যবে দোঁহে ডাকিল কাতরে,—
'রক্ষা কর ভগবান!'

লেডী-ম্যাক্। এস না এ ঘোর ভুর্ভাবনা!

ম্যাক্‌বেথ। কেন নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ মম প্রয়োজন সমধিক ;
'শান্তি' উচ্চারিতে কণ্ঠরোধ হ'ল মম।

লেডী-ম্যাক্। এরূপে এ সব চিন্তা নাহি দেহ স্থান,
উন্মত্ততা হবে তাহে।

ম্যাক্‌বেথ। যেন করিনু শ্রবণ, 'ঘুমাওনা আর' ;
'হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ।'…

লেডী-ম্যাক্। এ কি ভাব তব ?

ম্যাক্‌বেথ। কহিল আবার—
'ঘুমা'ও না আর নিদ্রাগত গৃহবাসিগণে
গ্লামিসের অধিপতি নিদ্রা করে নাশ,…
ম্যাক্‌বেথ না ঘুমাইবে আর।'

(গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অংশ)

[উদ্ধৃতাংশে রাজা ভীমসিংহের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা যথার্থ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ।]

[ভৃত্য সহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ]

রাজা। রামপ্রসাদ!

ভৃত্য। মহারাজ।

রাজা। এই পত্র কখানা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ্, তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। উত্তরের মর্ম যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান]

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে!

তপস্বিনী। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহু দিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি

যে কি পর্যন্ত সুখী হলেম তার আর কি বলবো ? রাজমহিষী কোথায় ? তাঁকে যে এখানে দেখচি নে ?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন ?

তপ। আজ্ঞা,—আমি তীর্থপর্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্বপ্রকার মঙ্গল ত ?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কিনা, তা বলা দুষ্কর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে ? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন ; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচ্চ্যেন। শরৎকালের শশীর ন্যায়, বিপদ্‌মেঘ হতে পুনঃ পুনঃ মুক্ত হয়ে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রষ্ট হতে পারে ? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

[রাণী অহল্যাদেবীর প্রবেশ]

আসুন, মহিষী আসুন।

[ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ]

ভৃত্য। ধর্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর বোধ হয়, এ রাজ্য কিছুকালের জন্যে নিরাপদ হলো। [ভৃত্যের প্রস্থান]

অহল্যা। নাথ, এ কি প্রকারে হলো ?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে এক প্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশলক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা দুর্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো। শত্রুবল স্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে ; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে সে কথাটি মনে হলে আমার আর এক দণ্ডের জন্যও প্রাণধারণ করতে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) হায় ! হায় ! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্য রক্ষা কত্যে হলো ? ধিক্ আমাকে ! এ অপেক্ষা আমার কি গুরুতর অপমান হতে পারে ?

(মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের অংশ বিশেষ।)

॥ ছয় ॥

[ঔরংজেব বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। পৌত্র মহম্মদকে সাজাহান কাতর অনুনয় করেছেন, একবার তাঁকে বন্দীশালার বাইরে যেতে দেবার জন্য। বিনিময়ে তিনি মহম্মদকে দিল্লীর রাজসিংহাসনে বসাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পিতৃ-প্রদত্ত কর্তব্য থেকে মহম্মদ কোনো প্রলোভনেই বিচ্যুত হলেন না। সাজাহান এবং জাহানারা উভয়েই মহম্মদের এই অসাধারণ পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন।]

(মহম্মদের প্রবেশ)

সাজাহান। এই যে মহম্মদ! তোমার পিতা কৈ!

মহম্মদ। তা ত জানি না ঠাকুর্দা!

সাজাহান। সে কি! সে এখানে আসবার জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে শুনলাম—

মহম্মদ। কে বল্লে! তিনি ত ঘোড়ায় চড়ে' আকবরের কবরে নমাজ পড়তে গেলেন। আমি ত যতদূর জানি, তাঁর এখানে আসবার কোন অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ?

মহম্মদ। এ প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার কর্ত্তে!

সাজাহান। সে কি? না তুমি পরিহাস কর্চ্ছ মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুর্দ্দা, এ সত্য কথা।

জাহানারা। বটে! তবে আমি তোমাকেই বন্দী করব।

[বাঁশী বাজাইলেন। সশস্ত্র পঞ্চ প্রহরীর প্রবেশ]

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ।

মহম্মদ। সে কি!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দী! সৈনিকগণ! অস্ত্র কেড়ে নাও।

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে হ'লো।

(বাঁশী বাজাইলেন। দশজন রক্ষীদের প্রবেশ)

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক? কে তাদের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতে দিলে?

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম! ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝবো যে আমি তোমার হস্তে বন্দী?

মহম্মদ। বন্দী ন'ন ঠাকুর্দ্দা। তবে আপনার বাইরে যাবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি নে। একি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে? আমি সম্রাট্ সাজাহান? তুমি আমার পৌত্র, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরবারি খুলে? একি! একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্টে গেল? একদিন যার রোষকষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্দ্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত তার—তার পুত্রের হাতে—সে বন্দী। জাহানারা! কৈ! এই যে! একি কন্যা! তোর ঠোঁট নড়ছে, কথা বার হচ্ছে না; চক্ষু দিয়ে একটা নিস্প্রভ স্থির শূন্য দৃষ্টি নির্গত হচ্ছে; গণ্ড দু'টি ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে। কি হয়েছে মা?

জাহানারা। না বাবা! কিন্তু জানতে পারলে কেমন করে'! আমি শুধু তাই ভাবছি।

সাজাহান। মহম্মদ! ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এইরকম ব'সে নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর্ব্ব! ভেবেছো এই কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তা'কে পদাঘাত করে' যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু আমি সাজাহান। এই, কে আছো! নিয়ে এসো আমার বর্ম্ম আর তরবারি।—কৈ, কেউ নেই!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বা'র করে' দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায়। এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীদের কাজ কর্ব্বে।

সাজাহান। মহম্মদ! বিশ্বাসঘাতক!

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র।

সাজাহান। ঔরংজীব! না, আজ সে কোথায়, আর আর আমি কোথায়! তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে পার্ত্তাম, তা হ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়তো! একবার খোলা পাই না! একবার খোলা পাই না। মহম্মদ! আমায় একবার মুক্ত করে' দাও। একবার! একবার!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমায় দোষ দেবেন না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাহাজান। আর আমি তোমার পিতার পিতা না? সে যদি তার পিতার প্রতি হেন অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হবে! —মহম্মদ! এসো! দুর্গদ্বার খুলে দাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা! আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ন, জীর্ণ, স্থবির। আর কিছু চাই না। শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাইরে যেতে চাই। আবার ফিরে আসবো শপথ কচ্ছি। দেবে না—দেবে না?

মহম্মদ। ক্ষমা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা—আমি তা পার্ব্বো না। (গমনোদ্যত)

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ! [কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরাণ লইয়া] দেখ মহম্মদ। এই আমার মুকুট, এই আমার কোরাণ, স্পর্শ করে' আমি শপথ কচ্ছি যে বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো! কারো সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে। আমি আজ শীর্ণ পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে; কিন্তু সম্রাট সাজাহান এ ভারতবর্ষে এতদিন ধরে এমন শাসন করে' এসেছে যে, যদি সে একবার তা'র সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, তা হ'লে শুদ্ধ তা'দের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হ'য়ে পুড়ে' যাবে।—মহম্মদ! আমায় মুক্ত করে' দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে! আমি শপথ কচ্ছি মহম্মদ! শপথ কচ্ছি! আমি শুধু এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখাবো। মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সাজাহান। দেখ! এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট্ সাজাহান—কোরাণ স্পর্শ করে' শপথ কচ্ছি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়। শপথ কচ্ছি—দেখ, এক দিকে তোমার পিতার আজ্ঞা আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্ত্তে।

মহম্মদ। ঠাকুরর্দ্দা, আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও না।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ! বিবেচনা করে' দেখ। ভাল করে' বিবেচনা কর—ভারতের অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা শুনবো না। প্রলোভন বড়ই অধিক। হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্ব্বেন। [প্রস্থান]

[মহম্মদের প্রস্থানের পর সাজাহানের উক্তি তাঁর কন্যা জাহানারার প্রতি এবং দুইজনের—কথোপকথন।]

সাজাহান। চলে' গেল! চলে' গেল! জাহানারা! কথা কচ্চিস্ না যে!

জাহানারা। ঔরংজীব! তোমার এই পুত্র! যে তা'র পিতার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে

একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তাঁকে ছলে বন্দী করেছো !

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা ! পিতাসব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না ; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না ; তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তা'রা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তা'রা সব শিশু শয়তান। তা'দের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তা'দের সকালে বিকালে জোরে কষাঘাত কোরো। তা'দের সারা জীবনটা চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হলে বোধ হয় তা'রা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তাদের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে ত বুক ভেঙ্গে ফেলো, চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে তুলে ফেলো ; আর্ত্তনাদ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় ত নিজের টুঁটি চেপে ধ'রো। ওঃ—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে ব'সে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না ; পদাহত পঙ্গুর মত ব'সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে' ডাকলে কিছু হবে না। উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন ; হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে উঠুন। নিয়তির মত কঠিন হৌন ; হিংসার মত অন্ধ হৌন ; শয়তানের মত ক্রূর হৌন। তবে তার সঙ্গে পার্ব্বেন।

সাজাহান। উত্তম ! তবে তাই হোক ! আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে' উঠি', তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয় ! আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্য খানি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তা'কে এসে গ্রাস কর্। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি ; তুই মড়ক নিয়ে আয় ! আয় ত ; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চ'লে যাই—তারপর কোথায় যাই ?—কিছুই যায় আসে না। ধূপের মত একটা বিরাট জ্বালায় ঊর্দ্ধে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

(দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য)

॥ সাত ॥

[মাহিষ্মতী পুরীর রাজা নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া বন্দী করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব সহায় ; তাই নীলধ্বজ পুত্রকে আদেশ দিলেন ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে। প্রবীর যথার্থ বীর। তাই পিতার এই আদেশে তাঁর ক্ষুব্ধ মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে জননী জনার কাছে তিনি অকপটে তা স্বীকার করেছেন।]

জনা ও প্রবীর

প্রবীর। দাও মা গো সন্তানে বিদায় !
চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি,
ক্ষত্রিয় সন্তান, অপমান কেন সব ?
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
আদেশ পিতার
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে !
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন—
করি অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ
চলে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি !
বৃথা ধনু ধরেছি মা করে,
বিফল জীবন,
শত্রু ভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব !
বীরদম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি,
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয়নন্দন
পরাজয় মানি লব ?
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,
কেন মা গো ধরেছিলে গর্ভে মোরে ?

জনা। বৎস ! ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি !
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জয়ে সম্মান প্রদানে।

প্রবীর। ডরে পূজা-ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,

ঘৃণায় অৰ্জ্জুন
কথা নাহি কবে মম সনে ;
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে ;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী ?
রণে যদি না যাই, জননী
দেবতার হবে অপমান।
মাগো ! তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীট নারে তব পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে ?

জনা। নয়ন আনন্দ তুমি জীবন আমার,
ভাবি মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ !

প্রবীর। রণমৃত্যু হ'তে কিবা আছে মা কল্যাণ ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে ?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননী ?
ক্ষত্রিয় নন্দিনী কার ভীরু পুত্র সাধ ?
পিতার নিষেধ যদি,
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন—
রাখিব জীবন ছার,
মনে স্থান নিও না জননী !
রণে যদি যেতে মোর মানা,
বন্দিয়া চরণ—
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।

জনা। স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।

হয় হো'ক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

(গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের অংশ বিশেষ)

॥ আট ॥

[কিশোর বীর প্রবীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরেরা পরাজিত ও অপমানে ক্ষুব্ধ। প্রবীরের এই অনন্য পরাক্রমের উৎস কোথায়, ভীম, বৃষকেতু প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ তা জানিয়েছেন।]

রণস্থল

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু, অনুশাম্ব

ভীম। বৃথা বীর্যবল, বিফল গৌরব,
পরাভব বালকের রণে!
হা কৃষ্ণ, এ হেয় প্রাণ না রাখিব আর;
বাহুদ্বয় করিব ছেদন,
প্রবেশিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে
বধিলাম হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বকে,
শত ভাই কীচক নিপাত ভুজবলে,
শত ভাই দুর্য্যোধন চূর্ণ গদা ঘায়—,
কেন হরি নিবারিছ আর
বধুক বালক মোরে পুনঃ যাই রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও বীরবর, হরে নাহি বল;
যতক্ষণ মহাদেব বল না হরিবে,
প্রবীরে ফিরাতে কেহ কদাচ নারিবে।

ভীম। ধিক্ ধিক্
হা কৃষ্ণ এ অপমানে ফেটে যায় প্রাণ!

বৃষকেতু। শুভক্ষণে রাজপুত্র ধরেছিল ধনু,
কোটি বাণ পলকে ঝলকে ধনুগুর্ণে।
প্রাণপণে আক্রমণ করি
নারিলাম আঘাতিতে বীরে,
অস্থিমাত্র সার মম প্রবীর সমরে

অনুশাম্ব। দানবীয় মায়া যত করিনু প্রকাশ,
হ'লো নাশ বালকের শরে,
তিনপুরে নাহি বীর প্রবীর সমান।
স্বচক্ষে দেখেছি
গুণহীন করিল গাণ্ডীব,
দীপ্তিমান লক্ষ লক্ষ বাণ
ছাড়ে বীর আঁখি পালটিতে।
কিরূপে সংগ্রাম-জয় হবে হৃষীকেশ ?
ভীম। রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্ব্বেদী দ্রোণ সনে করিয়াছি রণ,
কিন্তু এ হেন বিক্রম—
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান।
বল মোরে শ্রীমধুসূদন,
কেমনে দুর্জ্জয় রিপু হইবে নিপাত ?
শ্রীকৃষ্ণ। যা কহিলে সত্য বীরবর,
প্রবীরে নিবারে রণে নাহি হেন জন।
শূল করে শঙ্কর সহায় তার।
আগত যামিনী, লভ শিবিরে বিরাম,—
আজি নিশার মতন
সন্ধি করেছি স্থাপন ;
কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে,
প্রবীর পড়িবে রণে অর্জ্জুনের করে।

[সকলের প্রস্থান]

(গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের সপ্তম গর্ভাঙ্ক।)

॥ নয় ॥

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

যাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি ! যাদব, যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন্, আমরা খাব।

যাদব। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা। [যাদবের প্রস্থান]

প্রফুল্ল। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে?

প্রফুল্ল। আমায় পাঠিয়ে দিলে; ব'ল্লে. তোমাদের বড় দুঃখ হ'য়েছে ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আসছি ব'লে এসেছি; কিন্তু দিদি তোমাদের নিয়ে যাব না; কি তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না; 'যেদো যেদো' ব'লে কি ফুস্‌ফুস্ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি; তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না!

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট্ ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি; রাত্রে একটু কেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন্ আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলুম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করে, এ যাতনা আর দেখতে পারি নি, আজ আমাকে বা'র ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারিনি, রাখবে কেন? মনে করেছিলুম, ভিক্ষে করে দুটি খাইয়ে জলে গিয়ে ডুববো; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি তুমি কেঁদো না, আমার এ গয়নাগুলি নাও, এ বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকতুম, মাকে দেখবার মত কেউ নেই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি করবো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার গয়না আমি কি করবো? এ তো থাকবে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সেদিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙে চুরি ক'রে নিয়ে গেল, আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর ভাড়ার টাকা এনেছিলুম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি তুমি কি আমায় পর ভাবছো? আমি তোমার পর নই আমি তোমার সেই ছোট বোন; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের! আমি যাদবের জিনিস যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলুম, কি হয়েছি। আমার বাড়ীর যে

৩

সব সামগ্রী কুকুর বেড়ালের খেয়ে অরুচি হ'য়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না, যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগলে কাতর হ'ত, সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতুম, সে কাপড় যাদবের নেই; কখনও চন্দ্র সূর্য্য-মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে চলেছি—

(মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত "প্রফুল্ল" নাটকের অংশ)

॥ দৃশ্য ॥

[ত্যাগের মহামন্ত্রে সগর সিংহ দীক্ষিত হইলেন। দেশ এবং জাতির প্রতি কর্তব্যবোধে তিনি উদ্‌বুদ্ধ হইলেন, তাই পরাধীনতার জ্বালা নিবারণ কল্পে আত্মহত্যা করিয়া জীবন সার্থক করিলেন।]

[স্থান জাহাঙ্গীরের সভা। কাল প্রভাত। সম্রাট জাহাঙ্গীর, সভাসদ হেদায়েৎ আলি খাঁ।]

জাহাঙ্গীর। এ অপমান মরলেও যাবে না। এত অপদার্থ পরভেজ। হারলে কি বলে!

হেদায়েৎ। জাহাঁপনা, আমি এ বিষয়ে শপথ করতে পারি যে শাহজাদার হারবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ, তোমরা সবাই অপদার্থ।

হেদায়েৎ। আজ্ঞে জাহাঁপনা, ঠিক অনুমান করেছেন।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ তুমি যুদ্ধে হেরে বন্দী হ'য়ে শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হ'য়ে এলে। আবদুল্লা তবু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তুমি যুদ্ধে মরতে পারলে না?

হেদায়েৎ। জাহাঁপনা, আমার বরাবরই সেই ইচ্ছা ছিল। তবে আমার গৃহিণী সে বিষয়ে আপত্তি করলেন।

জাহাঙ্গীর। চুপ—

[সগর সিংহের প্রবেশ]

জাহাঙ্গীর। এই যে রাজা সগর সিংহ।—সগর সিংহ।

সগর সিংহ। সম্রাট্!

জাহাঙ্গীর। তোমাকে মেবারের রাণা ক'রে চিতোর দুর্গে পাঠিয়েছিলাম। তুমি চিতোর দুর্গ রাণা অমর সিংহের হাতে সমর্পণ ক'রে এসেছো?

সগর। হ্যাঁ সম্রাট।

জাহাঙ্গীর। কার হুকুমে?

সগর। কারো হুকুমের অপেক্ষা রাখিনি সম্রাট।

জাহাঙ্গীর। তবে ?

সগর। আমি বুঝলেম যে চিতোর ন্যায়তঃ রাণা অমর সিংহের।

জাহাঙ্গীর। বুঝলে ?

সগর। হ্যাঁ সম্রাট্! আমি শুনলাম যে সম্রাট আকবর ন্যায়যুদ্ধে চিতোর অধিকার করেন নি। তিনি ছলে জয়মলকে বধ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর। তোমার এত ন্যায়-অন্যায় বিচার কবে থেকে হো'ল রাজা ?

সগর। যে দিন থেকে আমি একটা নূতন আলোক দেখলাম।

জাহাঙ্গীর। নূতন আলোক দেখলে, বিশ্বাসঘাতক !

সগর। হ্যাঁ সম্রাট! নূতন আলোক দেখলাম। আমার চক্ষের সম্মুখে সহসা একটা যবনিকা উঠে গেল। সেই রামায়ণের যুগ থেকে মেবারের একটা গৌরবময় অতীত আমার চক্ষের সামনে দিয়ে ভেসে গেল! বাপ্পারাওয়ের বিজয়কাহিনী, সমর সিংহের আত্মবলি, চণ্ডের ত্যাগ, কুম্ভের শৌর্য,—এর একটা মহিমময় অভিনয় দেখলাম। হঠাৎ একটা কুজ্ঝটীকায় সেই দীপ্ত রঙ্গমঞ্চ ছেয়ে এলো। আর সেই কুজ্ঝটীকার মধ্যদিয়ে প্রতাপ সিংহের, আমার ভাই প্রতাপসিংহের খড়্গ ঝল্‌সাতে লাগলো। আমার মনে ধিক্কার হ'ল !

জাহাঙ্গীর। তারপর ?

সগর। ধিক্কার হ'ল, যে সেই বংশেরই আমি সেই গৌরবকে ধ্বংস করবার জন্য তার আততায়ীর সঙ্গে একটা নাটকীয় ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি। তবু আমার মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, উচিত কাজ করেছি। তারপরে একদিন দেখলাম— কি দেখলাম জাহাঁপনা, সে অপূর্ব দৃশ্য ! [তিনি গর্বে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন]

জাহাঙ্গীর। কি, শুনি !

সগর। এ আর অতীত নয়, পুরাণ নয়, ইতিহাস নয়। দেখলাম যে আমার কন্যা এই অধম মোগলের উচ্ছিষ্টভোজীরই কন্যা, সেই দেশের জন্য চীরধারিণী, বনচারিণী, সন্ন্যাসিনী—যে দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্য মোগলের সঙ্গে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে আমি যোগ দিয়েছি। আমার চক্ষু জলে ভ'রে এলো, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল; একটা লজ্জায়, গর্বে, স্নেহে, ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেল। আমি আর পারলাম না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে চিতোর দুর্গ দিয়ে এলাম।

জাহাঙ্গীর। মরার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছ সগর সিংহ ?

সগর। সম্পূর্ণ। আগে মরতে বড় ভয় করতাম। কিন্তু সেদিন আমি এক নবমন্ত্রে দীক্ষিত হ'লাম।

জাহাঙ্গীর। কি নব মন্ত্র সগর সিংহ।

সগর। ত্যাগের মন্ত্র। পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান, আর একটির দেবতা ঈশ্বর। আমি এতদিন স্বার্থের রাজ্যে বাস করেছিলাম। সেদিন ত্যাগের রাজ্য দেখলাম। সে রাজ্যের রাজা বুদ্ধ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ; সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে রাজ্যের শাসন সেবা, রাজদণ্ড, অনুকম্পা, পুরস্কার, আত্মবলিদান। আমি সেদিন থেকে সেই রাজ্যের রাজা হ'লাম। যে হস্তে কখন তরবারি ধরি নাই, সে হস্তে আর্তরক্ষার্থে তরবারি ধরলাম। আমার স্কন্ধে দস্যুর খড়্গাঘাত, কুসুমের মত কোমল বোধ হ'ল।

জাহাঙ্গীর। তারপর?

সগর। তারপর আমি এখানে মৃত্যুতে আমার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এলাম। আগে মরতে বড় ভয় করতাম। কিন্তু আর ভয় করি না। যে প্রাণ ভ'রে ভালবাসতে পারে, যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, তার আবার মরতে ভয়!

জাহাঙ্গীর। উত্তম, তবে তাই হোক্।—প্রহরী— (প্রহরীর প্রবেশ)

সগর। প্রহরী কেন, জনাব! জল্লাদের সে কাজ আমি নিজেই করছি।

(সগর সিংহ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

নাটক অভিনয় এবং নাটক পাঠ এক বস্তু নয়।

নাটকে বর্ণিত ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখানো অভিনেতার প্রধান কাজ এবং কর্তব্য। নাটক অভিনয় করবার সময় তাই অভিনেতাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার করতে হয়, কি ভাবে কি উপায়ে দর্শকদের সামনে বিষয়টি প্রত্যক্ষবৎ দেখানো যেতে পারে। নাটক অভিনয় দেখাবার প্রধান উপাদান এবং প্রথম উপায় দৃশ্যপট, দ্বিতীয় উপায় সাজ-সজ্জা এবং তৃতীয় উপায় রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনয়।

অভিনেতার জানা উচিত, অভিনয়ের অংশ তিনটি; যথা—আবৃত্তি, মুখভঙ্গী এবং অঙ্গভঙ্গী।

কিন্তু নাট্যাংশ পাঠ বোধকরি আরো কঠিন। কারণ, এখানে মুখভঙ্গী এবং অঙ্গভঙ্গীর কোন সুযোগ নেই। তাই পড়বার সময় ভাবকে যতখানি সম্ভব শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করতে হবে। যেমন, রেডিওতে নাটক পাঠ হয়। শুধু টানা পড়ে গেলে তা মনে কোন রেখাপাত করে না, কিন্তু যথাবিধি ভাব অনুসরণ করে স্বর প্রক্ষেপ করলে তা অবশ্যই শ্রোতার আনন্দবিধান করবে। কোন জায়গায় স্বর ক্রমে ক্রমে উঁচু গ্রামে তুলতে হবে, কোথায় ক্রমে স্বর নিম্নগ্রামে নামাতে হবে, কোন জায়গায় ধীরে ধীরে কোন জায়গায় দ্রুত আবৃত্তি করতে হবে। নাটক পাঠ করবার সময় সে-দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। নাট্যাংশের অন্তর্গত আদ্যন্ত প্রত্যেক বর্ণ স্পষ্টভাবে নির্ভুল করে উচ্চারণ করতে হবে। তবেই নাট্যাংশ পাঠ শুনতে ভাল লাগবে।

নাটকের মূলরস, অন্তর্নিহিত অর্থ এবং লেখকের নাটক রচনার উদ্দেশ্যকে নাটক পাঠের মাধ্যমে সর্বস্তরের শ্রোতার মনে রেখাপাত করানোই হবে বক্তার চরম লক্ষ্য। তবেই অর্জন করবে চরম সাফল্য।

তিন

॥ গদ্যাংশ ॥

ভূমিকা—পদ্যের মত গদ্যেরও একটি অন্তর্নিহিত সুর আছে। যথাযথ বিরাম চিহ্ন অনুসরণ করে স্পষ্ট উচ্চারণে অর্থ অনুযায়ী গদ্যাংশ পাঠ করলে সেই ঝঙ্কার শ্রোতার মনে প্রত্যাশিত আবেদন সঞ্চার করতে সমর্থ হয়।

গদ্য ভাষা দ্বিবিধ—সাধু এবং চলিত। সাধু ভাষায় সর্বজনবোধ্য তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশী। সাধু ভাষায় সর্বনামপদ এবং ক্রিয়াপদ পূর্ণাঙ্গ। চলিত ভাষায় সর্বনামপদ এবং ক্রিয়াপদ হ্রস্বাঙ্গ।

সাধুভাষার চাল গম্ভীর; চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত লঘু। চলিত ভাষায় স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

চলিত ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথনের সঙ্গে যোগ থাকায় এই ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য।

সাধু ভাষাই হোক আর চলিত ভাষাই হোক গদ্যপাঠের নিয়ম একই। পাঠ সুন্দর করতে হলে পাঠককে পঠিত অংশ অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হবে। অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম না হলে পাঠ কখনও সুন্দর ও বোধগম্য হয় না। অতএব পাঠকের প্রাথমিক কর্তব্য অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা। অর্থ না বুঝলে পাঠ নিম্ন মানের হয়। ধরো লেখা আছে, 'হরেক রকম বাজী ও বারুদের কারখানা'। অর্থ না বুঝে পড়ল, 'হরে কর কমবা জীওবা রুদেরকা রখানা'। পাঠ করবার দ্বিতীয় নিয়ম বিভিন্ন যতিতে নির্দিষ্ট বিরাম দেওয়া। পূর্ণচ্ছেদে একটু বেশী থামতে হয়, সেমিকোলনে একটু কম, এবং কমাতে আর একটু কম। এর উপর আছে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য। হাল্কা হলে পাঠের চালও হাল্কা হবে, বিষয়বস্তু ভাবগম্ভীর হলে পাঠেও গাম্ভীর্য থাকবে।

॥ এক ॥

(বাংলাভাষার সাহিত্যিকদের কিছু গদ্যাংশ নীচে উদ্ধৃত করা হোল।)

রবিবারের কুঠীওয়ালারা বড় ঢিলে দেন—হচ্ছে হবে—খাচ্ছি খাব—বলিয়া অনেক বেলায় স্নান আহার করেন। তার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা তাস পেটেন—কেহ বা মাছ ধরেন—কেহ বা তবলায় চাঁটি দেন—কেহ বা সেতার লইয়া

পিড়িং পিড়িং করেন—কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুঝেন—কেহ বা বেড়াতে যান—কেহ বা বহি পড়েন। কিন্তু পড়াশুনা অথবা সৎ কথার আলোচনা অতি অল্প হয়ে থাকে। হয়তো মিথ্যা গালগল্প কিম্বা দলাদলির ঘোট, কি শম্ভূ তিনটা কাঁঠাল খাইয়াছে এই প্রকার কথাতেই কালক্ষেপণ হয়। বালীর বেণীবাবুর অন্যপ্রকার বিবেচনা ছিল। এদেশের লোকদিগের সংস্কার এই যে স্কুলে পড়া শেষ হইলে লেখাপড়ার শেষ হইল। কিন্তু এ বড় ভ্রম, আজন্ম মরণ পর্যন্ত সাধনা করিলেও বিদ্যার কূল পাওয়া যায় না। বিদ্যার চর্চা যত হয় ততই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে। বেণীবাবু এ বিষয় ভাল বুঝিতেন এবং তদনুসারে চলিতেন। (আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র)

॥ দুই ॥

বৈজ্ঞানিকের সহিত সাহিত্যিকের একটি স্থানে মিল আছে। ইতর সাধারণ সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সেই কয়টা জিনিষকে জীবনের কাজে লাগাইয়া, যেন তেন প্রকারেণ তাড়াতাড়ি জীবনযাত্রায় দৌড়িয়া চলিতেছে; আশে পাশে যাহা আছে, তাহার প্রতি মনঃ সংযোগের অবকাশ পাইতেছে না। কিন্তু কয়েকজন লোক এই আশে পাশে চাহিয়া অন্যে যাহা দেখে না, তাহাই দেখেন এবং ইতর সাধারণকে তাহা দেখান, তখন তাহারা নূতন কি দেখিলাম বলিয়া চমকিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক বলেন—'দেখ, এত বাস্তবিক সত্য, তা তুমি এতদিন দেখ নাই; ইহা হইতে জীবনের কত প্রয়োজন সিদ্ধি, জীবনযুদ্ধে কত সাহায্য ঘটিতে পারে।' সাহিত্যিক বলেন, 'দেখ, এত সুন্দর দৃশ্যের প্রতি তুমি এতকাল তাকাও নাই, ইহা হইতে কত আনন্দ মিলিতে পারে, জীবনযুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ কত কমাইতে পারা যায়।' একজন যেখানে সত্যের, অন্যজন সেখানে সুন্দরের আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের দৃষ্টি একই দিকে; আবার উভয়েই যখন সেই সত্যকে—সুন্দরকে শিবরূপে প্রতিপন্ন করেন, তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েই তত্ত্ববিদ্যার পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়। (চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

॥ তিন ॥

...মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার

আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্তদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়; সক্রেতিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে কাব্য বলি।

(কমলাকান্তের দপ্তর—পতঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্র)

॥ চার ॥

…সে ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন বিস্তৃত পিতাম্বরী শাড়ী। তাহার উপর মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ, সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল-পীত-পুষ্পময়-হরিৎক্ষেত্র-মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তিসকল যে ক্ষোদিয়াছিল,—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?

(সীতারাম—বঙ্কিমচন্দ্র)

॥ পাঁচ ॥

লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সততসঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন

থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া, প্রবলবেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম। লক্ষ্মণ, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া, আহারোপযোগী ফলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন ; গোদাবরী তীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা, প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

(সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

॥ ছয় ॥

মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটি পা স্থির থাকে, অপরটি অগ্রসর হয়, আবার সেইটি স্থির হয়, পূর্ব্বেরটি অগ্রবর্তী হয়। অতএব গমনরূপ একটি কার্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাব দুইটিই বিদ্যমান থাকে। জীবন-বর্ত্মের চলনেও ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তি-প্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তি প্রভাবে বিশ্রাম। প্রাণিশরীর জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া সমুদয় দেহে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে, আবার হৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্তিত শোণিত ধারা আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্ত-প্রবহণ-ব্যাপারে সঙ্কোচন এবং প্রসারণরূপ বিপরীত উভয় কার্যের সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনরক্ষাও ঐ প্রকারে হইয়া থাকে।

(ঐহিকতা—ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

॥ সাত ॥

হে ভারত, এই পরাজয়বাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে, তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভূলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহা-মানবের ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত,

তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ করে।" (বর্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ)

॥ আট ॥

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষ ভাবে স্মরণ করে,—বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে, সেই দিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখ-দুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন নহে—যেদিন প্রাকৃতিক নিয়ম পরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলীর মত ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে;—সেদিন ত আমরা জড়ের মত, উদ্ভিদের মত, সাধারণ জন্তুর মত—সেদিন ত আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানব-শক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না—সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সঙ্গীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ। (উৎসবের দিন—রবীন্দ্রনাথ)

॥ নয় ॥

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই

দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীন বুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু, তখন আমরা সেই দুরবস্থার কারণকেই পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিসটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাইরের আগন্তুক, স্বাস্থ্যতত্ত্বই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চির পুরাতন চির নূতন প্রতিষ্ঠা ; মনের স্বাস্থ্যকে, আত্মার শক্তিকে প্রবল করবার জন্যে উজ্জ্বল করবার জন্যে ভারতের একান্ত আপন যে সাধন-সম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন ; সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু ব'লে ঘোষণা করেছিল।

(চরিত্র পূজা—রবীন্দ্রনাথ)।

॥ সন্ধ্যা ॥

কাল অনেক দিন পরে, সূর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি-অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে ; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। আর বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহ বেশে কে সাজিয়ে দিল! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!

(ছিন্নপত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথ)

॥ এপার ॥

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া একান্ত করিয়া দেখা যায়,

ইহা যেন এই আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য্য তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে। এই যে আকাশ-বাতাস—স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! আহা এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার, সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার। কিন্তু সে কি শুধু আলোর অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না, তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো। ·· (শ্রীকান্ত—শরৎচন্দ্র)

॥ কালো ॥

যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধ'রে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চলে না, বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হ'ল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাবাতত্ত্ববিদ্ এমন কথায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ্ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে, তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো, এর সাধনা বড় কঠিন। (সুন্দর—অবনীন্দ্রনাথ)

॥ ভেদ ॥

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে ধর্ম্মচ্যুত হ'য়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাঙ্গালা-দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি,

বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। (সাহিত্যে খেলা—প্রমথ চৌধুরী)

॥ চৌদ্দ ॥

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যার গৃহ নেই তাকে কখনও গাছের তলে, কখনও মাঠে, কখনও খড়ের গাদায়, কখনও দয়াবানের কুটীরে আশ্রয় নিতে হয়; যার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নয়। যে নৌকো হালের অধীন নয় সে কিছুতেই স্বাধীন বলে গর্ব করতে পারে না, কারণ সে শত সহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ুহিল্লোলের অধীনতায় দশ দিকে ঘুরে মরতে হবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নেই। অতএব স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নয়; স্বাধীনতার অর্থ কখনও হাল, এখনো নোঙরের শৃঙ্খলকে সম্মান করা। (রবীন্দ্রনাথ)

॥ পনের ॥

রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে ইহা গড়িয়া উঠে নাই, আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠন প্রণালীও ইহার ছিল না। ইহার সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্মমুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে। বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিত প্রদীপ গৃহ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলা-চঞ্চল নৃত্য; সর্বোপরি কামনাপ্রবণ, আশা-আশংকা-উদ্বেল শিশু হৃদয়; এবং ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত, সরস, তরল কণ্ঠস্বর; এই সকল মিলিয়া যে একটি মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐক্যতান সৃষ্টি করে, তাহা ষ্টিলের কলমের মুখে, ছাপার বই-এর পাতায় ও সাহিত্য ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে।

(রূপকথা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

॥ ক্ষোভ ॥

যাত্রার দিন অতি প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্বে হস্তিনী ভোজন করিতেছে। বাড়ীর মেয়েরা বালক-বালিকাগণ সজল নেত্রে বাগানে হাতীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলি খাদ্য শেষ হইল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন,—"আদর, যাও মা, বামুন-হাটের মেলা দেখে এস।" প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন। (আদরিণী ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

॥ সত্তেজ ॥

দেশাচার এই যে, রন্ধন কার্য্য শুচি হইয়া করিতে হয়। যজ্ঞীয় দ্রব্য শুচি হইয়া প্রস্তুত করা শাস্ত্রের আদেশ। স্নান করিয়া অথবা হাত পা মুখ ধুইয়া এবং কাপড় ছাড়িয়া রন্ধনশালায় যাইতে হয়। ইহাতে রন্ধন কার্য্যের প্রতি বিশেষ একটি শ্রদ্ধা জন্মে, রন্ধনও ভাল হয়। আর্য্যেতর জাতিদিগের, রন্ধন কার্য্যে আর যত গুণ থাকুক, উহার শুচিতা রক্ষার নিমিত্ত কোন যত্নই থাকে না। অতি বড় ইংরাজেরও বাবুর্চিখানায় প্রবেশ করিবামাত্র, ঘৃণা জন্মে। পাচকদিগের হস্ত, পদ, মুখ বস্ত্রাদি সাতিশয় ক্লিন্ন, ঘরের দুর্গন্ধ অসহ্য, ভোজন পত্রাদি পরিষ্কার করিবার প্রণালী অতি জঘন্য। খাদ্যসামগ্রী সকল রন্ধনশালায় প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিলে পর, তবে পরিবেষ্টৃগণ ফিটফাট হয় এবং দ্রব্যাদি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রে অন্নকে প্রজাপতি এবং ব্রহ্ম বলিয়াছেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়েই উহার সম্যক্ পবিত্রতা রক্ষা আমাদিগের কর্ত্তব্য। (পারিবারিক প্রবন্ধ ; ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

॥ আর্তার ॥

প্রাণপ্রিয় পুত্রের জন্য শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তান্বিত ও বিলাপমান কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর দেহাবসান হইল। সমস্ত কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর কুসুমোদ্যানগুলি যেন এককালে কুসুমশূন্য হইল

এবং দিগ্‌দিগন্ত হইতে কেবলমাত্র শুনা গেল, যে বালী পঞ্চদশ বর্ষ রাত্রদিন যুদ্ধ করিয়া ভীষণ পরাক্রান্ত গোলভ নামক গন্ধর্বকে নিহত করিয়াছিলেন সেই বিক্রান্ত পুরুষকে একটিমাত্র শরে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন—কিষ্কিন্ধ্যাবাসিগণ ইতস্ততঃ ভয়ে পলাইতে লাগিল। তারা বহু বিলাপ করিয়া শেষে সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু অঙ্গদ পিতৃশোক ভুলিতে পারে নাই, পিতার মৃত্যুকালে অঙ্গদ কোন বিলাপ করে নাই, রুদ্ধকণ্ঠে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুকালের এই ছবিখানি তাহার হৃদয়ে রক্তের রেখায় অঙ্কিত হইয়াছিল। সমুদ্রের উপকূলে বানরমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া অঙ্গদ বালীর কথা ও সুগ্রীবের ব্যবহার সম্বন্ধে যখন আর্তস্বরে সমস্ত কথা বলিতেছিল, তখন বানর-বাহিনী সাশ্রুনেত্রে শোককরুণ অস্ফুট স্বরে কাঁদিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছিল। বালীর মৃত্যুর জীবন্ত স্মৃতি অঙ্গদের তরুণ ললাট কালিমাকুঞ্চিত ও বিষণ্ণতায় চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল।

(বালী ; দীনেশচন্দ্র সেন)

॥ উনিশ ॥

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্! সাধ ক'রে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচিনে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল,—কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস দুয়েকের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হ'য়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ তো তুই—খেয়ে রেখেছিস্, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা রামরাজত্বে বাস করিস্—ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে ক'রে মরিস্।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে করব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল তো? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভ'রে খেতে পর্যন্ত পাই নে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ বিষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোণা যাচ্ছে—দাও না ঠাকুর মশাই, কাহন-দুই ধার, গোরুটাকে দুদিন পেট পুরে

খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীব্রবৎ দু-পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ-মর্‌—ছুঁয়ে ফেলবি না কি ?

(মহেশ ; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

॥ কুড়ি ॥

মাতব্বরেরা অবশ্য নির্বিবাদে পোলটা হইতে দেন নাই। প্রথম আপত্তি—তাঁহাদের মতামত, পরামর্শ ও সম্মতি লওয়া হয় নাই ; দ্বিতীয় আপত্তি—প্রথম শ্রেণীর মাল-মশলা ভিন্ন ওরূপ একটা জল-নিকাশের পথ কোন মতে হইতে পারে না ; তৃতীয় আপত্তি—স্থায়িভাবে ওই স্থানে জল-নিকাশের পথ রাখিলে ভাবী-কালে গ্রামের কোন অনিষ্ট আছে কিনা ; ও চতুর্থ আপত্তি—যে করিয়া দিতেছে, তাহার কোন দাবি দাওয়া ও স্বার্থ আছে কিনা, ইত্যাদি। যাহা হউক, যদুবাবু বিচক্ষণতার সহিত সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া কার্যটি সুচারুরূপে সমাধা করিয়া দিলেন এবং মিস্ত্রী ও মজুরদের মধ্যে কালীও একজন মজুর থাকায় কোথাও কোনোরূপ খেলো কাজের বা খেলো জিনিষ চালাইবার সুযোগও হইতে পায় নাই। পঁচাশী বৎসর গত হইলেও সেই তৃণাদপি সুনীচ কাঙালের হৃদপঞ্জরে গঠিত পথিকপদরজ-প্রার্থী পোলটি আজও অক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া আপন কর্তব্য পালন করিতেছে।

(কালী ঘরামী ; কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

॥ একুশ ॥

"লোক প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। তারপর কে ভিক্ষা দেয় ? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল। ঘর-বাড়ী বেচিল, জোত-জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী, কে কিনে, খরিদ্দার নাই। সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল,—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ, বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব

হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহাকেও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকেও দেখে না, মরিলেও কেহ দেখে না, যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।

(আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

॥ বাইশ ॥

এক অশ্ব একাকী এক মাঠে চরিয়া বেড়াইত। কিছু দিন পরে, এক হরিণ সেই মাঠে আসিয়া চরিতে আরম্ভ করিল এবং ইচ্ছামত ঘাস খাইয়া, অবশিষ্ট ঘাস নষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাতে অশ্বের আহার বিষয়ে অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। অশ্ব হরিণকে জব্দ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে, সে এক মনুষ্যকে নিকটে দেখিয়া কহিল, ভাই! এই হরিণ আমার অত্যন্ত অপকার করিতেছে, ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। যদি এ বিষয়ে সাহায্য কর, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয়। তখন মনুষ্য কহিল, তাহার ভাবনা কি? তুমি যদি আমাকে তোমার মুখে লাগাম দিয়া, পিঠে উঠিতে দাও, তাহা হইলে আমি অস্ত্র লইয়া তোমার শত্রু দমন করি। অশ্ব সম্মত হইল। মনুষ্য তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল; কিন্তু হরিণকে দমন করিতে না গিয়া, অশ্বকে আপন আলয়ে লইয়া গেল। তদবধি অশ্বগণ মনুষ্যজাতির বাহন হইল। (কথামালা—বিদ্যাসাগর)

॥ তেইশ ॥

অল্প টাকা নয়' সাড়ে পাঁচশো টাকা—সে কত টাকা। ব্যাগটা যেন দীনুর ভারী মনে হইতেছিল, সহসা দীনুর খেয়াল হইল—এ কি, সে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে যে। সে আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে পথের কোন্‌খানে কতদূর আসিল বুঝিতে পারিল না; কিন্তু মন তাহার দেশ-দেশান্তরের এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল। কে সে কোম্পানি? কিসের জন্য তাহাকে এত টাকা পাঠাইয়াছে সে? সে যেন দেখিতেছিল—বিশাল অন্ধকার অরণ্য, বাঘ সিংহ ভালুক সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোম্পানি কই? দীনু তাহার পিছনটা দেখিতেছে সে যেন পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে।

সহসা তাহার মনে হইল ওই কোম্পানি তাহার নিতাই নয়তো? নিতাই হয়তো

দেশান্তরে পলাইয়া গিয়া অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে, পাকা বাড়ী গাড়ী ঘোড়া চাকর—কল্পনার গভীর অরণ্যে মুহূর্তে গড়িয়া উঠে বাবুদের চুনকাম করা পাকা বাড়ীর মত বাড়ী। দীনুর সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হিম শীতল রাত্রির শীত জর্জর সেই শেষ প্রহরেও সে ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। কাঁধের কাগজের বস্তা যেন সোনায়-বোঝাই বস্তার মত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে; একটি পরম উত্তেজিত মুহূর্তে কাঁধ হইতে ব্যাগটা ধপ্ করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাহার পাশে দাঁড়াইল। চোখ দুইটি যেন জ্বলিতেছে। বুকের মধ্যে উৎকণ্ঠার পরিমাণ হয় না, হৃৎপিণ্ডটা শরবিদ্ধ পশুর মত যেন ছট্‌ফট্ করিতেছে। দীনুর ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্তে—এইখানেই ব্যাগটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া লয়।

পর-মুহূর্তে সে আবার ব্যাগটা ঘাড়ে তুলিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, প্রাণপণে ছুটিল।

("ডাক-হরকরা"—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

॥ চব্বিশ ॥

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাঁশ বাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে।...... তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে এইবার যদি পুরানো কোঠাটা! কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোহালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন নতুন বৌ! সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন'দি, একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাকো! ......একবার শিগ্‌গির আমাদের বাড়াতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করছে। নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা। কেন, কি হয়েচে দুগ্‌গার? ......সর্বজয়া বলিল—ক'দিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্চে আবার যাচ্চে—ম্যালেরিয়া জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশী—তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শিগ গির বট্‌ঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাতজাগা রাঙা-রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি

দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ ? —দাঁড়াও আমি এখনি ডেকে দিচ্চি—চল আমিও যাচ্চি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালখানা পড়ে গেল—বাবা কাল রাত্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি—শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কি না—দাঁড়াও আমি ডাকি—

(পথের পাঁচালী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

॥ পঁচিশ ॥

বাংলা ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙ্গলার ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। এই নদনদীগুলিই বাঙ্গলার প্রাণ ; ইহারাই বাঙ্গলাকে গড়িয়াছে, বাঙ্গলার আকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদীগুলি বাঙ্গলার আশীর্বাদ ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধহয় বাঙ্গলার অভিশাপও। এইসব নদ নদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে। সেইহেতু ব-দ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল নরম ও নমনীয়, এবং পশ্চিম, উত্তর পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূ-তত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্ট ভূমি। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাঙ্গলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলিয়াছে। উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মত, মত্ত ঐরাবতের মত ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। (বাংলার নদী—নীহাররঞ্জন রায়)

॥ ছাব্বিশ ॥

বাংলার মাটি, বাংলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত। তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্বে আমি বাংলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরূণ সোনার বাংলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাংলার আকাশ' বাংলার বাতাস—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"। বাংলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের

আদর্শ লইয়া আমি কর্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্বাসনের পরশমণি দিন দিন যে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাংলার ভাগীরথী ও বাংলার ঢেউ খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাংলার যে প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্যন্ত প্রতিভাবান্ মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাংলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তার আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এ হেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা।

(দেশাত্মবোধ—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু)

॥ সাতাশ ॥

"আমাদের এখন আবশ্যক শক্তির সঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে গুপ্তবিদ্যা, ভূতুড়ে কাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান্ সত্য থাকিতে পারে। কিন্তু ঐগুলিতে আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তোমাদের স্নায়ুকে সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লৌহ ও বজ্রের মত দৃঢ় পেশী ও স্নায়ু সম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিতেছি। এখন কাঁদিবার প্রয়োজন নাই। এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সকল মতবাদের আবশ্যক —যাহা আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। সত্য ফলপ্রদ, সত্যই পবিত্রতাবিধায়ক, সত্যই জ্ঞান স্বরূপ।"

॥ আটাশ ॥

"বাঙ্গালীর ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয়ে প্রচুর মাছ ছিল, তৃণশ্যাম শস্যক্ষেত্র ছিল, গোচারণ ভূমি ছিল, গাছে গাছে ফল ছিল। খড়ের ছাউনীর ঘর ছিল, সুনীল আকাশ ও সবুজ মাঠের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। চাষী সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘর্মাক্ত কলেবরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ঘরে মেঠোসুরে প্রাণের গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিত। বাংলার পুকুরের জল তখন মিঠা ছিল, চাষী বৎসরের ছয় মাস তাহার পেটের জন্য খাটিত, ঘরে ধানের মরাই ছিল, বাকী ছয় মাস সে গৃহস্থালী

করিয়া নানাবিধ পণ্যদ্রব্য তৈয়ারী করিত। সে চাষী এখন নাই, আর সে গৃহস্থও এখন নাই। ঘরে চাল নাই, গোরু দুধ দেয় না; তৃণশ্যাম ক্ষেত্র শুক্‌না কাঠ হইয়া ফাটিয়াছে। ঘরে সন্ধ্যাদীপ পড়ে না, দেবতা উপবাসী—সেবা হয় না, পেটের দায়ে হালের গোরু বেচিয়া কোন রকমে খাইয়া বাঁচে। জলাশয় শুকাইয়া কাদা হইয়াছে; জলকষ্টে, বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া চাষীর সে স্বাভাবিক স্ফূর্তি একেবারে নষ্ট করিয়াছে, তাহার যে সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল, তাহা হারাইয়া উৎকট ব্যাধি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।"

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

॥ উনত্রিংশ ॥

"ধনে কি মানুষ বড় হয়। ধনের বড় মানুষ কখনই মনের বড় মানুষ নহে। আমি ধন দেখিয়া তোমার সম্মান করিব না, জন দেখিয়া তোমার আদর করিব না; সিংহাসনে দেখিয়া তোমার সম্মান করিব না, বাহুবলের জন্য তোমার সম্ভ্রম করিব না, কেবল মন দেখিয়াই তোমার পূজা করিব। তুমি যদি স্বয়ং অমানুষ হও, অথচ দণ্ডধর হইয়া আমাকে দণ্ডদানে উদ্যত হও, তথাচ আমি দণ্ডভয়ে কদাচ তোমাকে দণ্ডবৎ করিব না। কিন্তু তুমি যদি পবিত্রচিত্তে সাধু সভাবে ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া আগমন কর, তবে তোমার দর্শন মাত্রেই আমি ধূলিধুসরিতাঙ্গ হইয়া পদতলে প্রণত হইব। অতএব যদি মানুষ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে মনকে বিমল কর ও সরল হও। আপনি ছোট হইলেই বড় হইবে, আপনাকে বড় জানিলে কখনও বড় হইতে পারিবে না।"

চার

॥ আলোচনা ॥ SYMPOSIUM OR DISCUSSION

ভূমিকা—কোন একটি বিষয়ের উপর পারস্পরিক মত বিনিময়কে **আলোচনা** বলা যায়।

আলোচনায় তর্কের কোন স্থান নাই। বিতর্ক সভায় দুটি দল থাকে। একটি প্রস্তাবনার পক্ষে ও অপরটি প্রস্তাবনার বিপক্ষে। এক দল অপর দলের বক্তব্য যুক্তি সহকারে খণ্ডন করে নিজ বক্তব্য যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা করেন। বিতর্কে কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। এর পরিধি সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ। কিন্তু আলোচনায় বা আলোচনা সভায় এত বিধিনিষেধ নেই। আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। সময়ের খুব কড়াকড়ি থাকে না; যেহেতু এখানে কোন প্রতিপক্ষ থাকে না—তাই বক্তব্য খণ্ডনের কোন ব্যাপার নেই, শুধুমাত্র বক্তারা **আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত** কোন বক্তব্য রাখবেন না, এই রকম একটি অলিখিত নিয়ম আছে।

প্রাচীন ভারতে কি বিতর্ক, কি আলোচনার বহু নজীর আছে। বিশেষকরে ধর্মীয় ব্যাপারের উপর। যেমন দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের লড়াই, ঈশ্বরবাদ-নিরীশ্বরবাদের লড়াই, একেশ্বরবাদ-বহুঈশ্বরবাদের লড়াই—এগুলি বিতর্কের পর্যায়ে পড়ে। কারণ এখানে একপক্ষ অপরপক্ষকে আক্রমণ করে অপরপক্ষের মতবাদকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এস্থলে মতবিনিময়ের অবকাশ ছিল না। অন্যদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে আলোচনাসভার নজীরও আছে। যেমন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর মহাসম্মেলনে মিলিত হতেন। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধধর্ম-শিক্ষকরাও মিলিত হতেন এবং পরস্পর মত বিনিময় করতেন। তাঁরা ধর্মপ্রচারে নিজ নিজ সুবিধা-অসুবিধার কথা আলোচনা করতেন এবং **আলোচনার মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট পথটি** খুঁজে বার করতেন।

বর্তমান পৃথিবীতে **'আলোচনা'**র প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়

আলোচনা। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি কোন মতবিরোধ ঘটে তা-ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কারণ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে মতবিরোধ ঘটে, আলোচনার মাধ্যমে তা যদি মীমাংসা না করা যায় তাহ'লে সেই বিরোধের শেষ পরিণতি যুদ্ধ। অর্থাৎ অনর্থক লোকক্ষয়, অর্থব্যয় এবং আরও অনেক ক্ষতি। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার মতবিরোধ যদি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা না করা যায়, তাহ'লে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়; অর্থাৎ অনর্থক অর্থব্যয় এবং বিলম্ব। এইসব কারণেই সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে আলোচনা' আজ সর্বজন স্বীকৃত।

আলোচনার বিভিন্ন রূপ আছে, বিভিন্ন পর্য্যায় আছে। আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখে আলোচনা করা চলে। আবার পত্র পত্রিকার মারফৎ লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমেও আলোচনা হয়।

সামাজিক আলোচনার বিষয়বস্তু মূলতঃ সমাজ সম্পর্কিত, সামাজিক সমস্যা-সম্পর্কিত। মানব সভ্যতার উষাকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সামাজিক কাঠামোতে কত না রূপান্তর, কত না পরিবর্তন ঘটেছে। লিখিত বা অলিখিত কত না আইন সমাজকে পরিচালিত করেছে। সামাজিক রূপান্তরের কারণ যা-ই হোক না কেন, এই সব নিয়ম-কানুনের পিছনের 'আলোচনার' একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আদিম যুগে মোড়ল বা প্রধানেরা গ্রামবাসী বা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে আইন প্রণয়ন ও চালু করতেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে সামাজিক কোন আইন প্রণয়নের আগে দেশব্যাপী সেই আইনের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা চলে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিন্দু-বিবাহ আইন, হিন্দু-উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি। পরিবার পরিকল্পনার উপর আজও কোনও আইন রচিত হয়নি—কিন্তু দীর্ঘদিন এ-সম্পর্কে আলোচনা চলছে এবং মোটামুটি আদর্শ পরিবার সম্পর্কে প্রচার-ও চলেছে। আগামী দিনে হয়ত এ ব্যাপারেও আইন হবে।

আজ সারা পৃথিবীতে সিগারেট খাওয়া খারাপ বা ভাল এই বিষয়ের উপর জোর আলোচনা চলেছে এবং বিভিন্ন প্রান্তে আলোচনা-সভায় বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ের উপর তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করছেন। বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে ধূমপান ভাল নয়, সিগারেট খাওয়া ভাল নয় এবং যত কম ধূমপান করা যায় ততই মঙ্গল। আগামী দিনে হয়ত ধূমপানের ক্ষেত্রেও আইন রচিত হবে।

আজ আমাদের দেশে খাদ্যসমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে, বিশেষজ্ঞগণের অভিমত থেকে তা আমরা জানতে পারি। তাঁরা বিভিন্ন

আলোচনা সভায় নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমরা জানি, অধিক ফসল উৎপাদনই খাদ্য সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। উন্নত প্রথায় চাষ, ভাল সার, উপযুক্ত জলসেচ, একই জমিতে বছরে দুবার বা তিনবার ফসল উৎপাদন, অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে রূপান্তর প্রভৃতির মাধ্যমে ফসল উৎপান বাড়ানো সম্ভব এবং আজ সেই প্রচেষ্টাই চলেছে। এইভাবে বহুবিধ সামাজিক সমস্যার আলোচনা করা চলে।

এবার আসা যাক রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায়। কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সমস্যা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা, তপশীল ও উপজাতি সম্প্রদায়কে বিশেষ অধিকার প্রদান, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের দেশে আজও প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। যদিও এই সব বিষয়ের উপর আমাদের দেশে আইন প্রচলিত আছে—তবুও একথা বলা যায় যে, প্রচলিত আইনের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনার বিরাম নেই।

পররাষ্ট্র নীতির উপর আলোচনারও বিরাম নেই। আমাদের দেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক কি রকম হবে তার উপর আলোচনা হয়। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হ'ল। এই যুদ্ধ কিভাবে বন্ধ করা যায় সে সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নায়কগণ আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে অনুরোধ জানাতে লাগলেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। যুদ্ধ বন্ধ হবার পর উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। প্র ম উভয় রা ষ্ট্রর সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে আলোচনা হলো এবং সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। অতঃপর উভয় রাষ্ট্রের কূটনৈতিকদের মধ্যে যুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা, যথা যুদ্ধ বন্দী বিনিময়, ক্ষতিপূরণ, সীমানা চিহ্নিত করন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন পর্য্যায়ে আলোচনা হলো। সর্বশেষে সিমলাতে ভারতের-প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর আলোচনা বৈঠক বসল। আলোচনা শেষে উভয় দেশের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তা' সিমলা-চুক্তি নামে খ্যাত। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপুঞ্জ তো আছেই, সেখানে মূলতঃ রাজনৈতিক আলোচনাই হয়।

অর্থনৈতিক বিষয়েও আলোচনা হতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কি রকম হবে, কত মূলধন লগ্নী হবে প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর আলোচনা চলেছে। দেশের অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন আলোচনা সভায় নিজেদের মতামত

ব্যক্ত করেছেন। সরকার এইসব মতামত পর্যালোচনা করে দেখেছেন। আমাদের দেশে আজ বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তার উপর জোর আলোচনা চলেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে বাণিজ্য-চুক্তি হয়, তা অর্থনৈতিক আলোচনারই ফল।

এই ভাবে সমস্ত বিষয়ের উপরই আলোচনা হতে পারে এবং হয়েও থাকে। যেমন, ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা, শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা, খেলাধূলা বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি।

সাধারণতঃ আলোচনা সভায় আমরা কি দেখতে পাই ? একজন সভাপতি থাকেন ও শ্রোতৃমণ্ডলী থাকেন। বক্তারা সভাপতি ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করে নিজ নিজ বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সভাপতি উপস্থিত বক্তব্যগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার শ্রোতাদের সামনে রাখেন।

আলোচনার উদাহরণ :

॥ এক ॥

[বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপরে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তারই কিয়দংশ তুলে দিছি। আলোচনা কত সুন্দর হয় দেখ।] (রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৮৯)

এককালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিসের সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ, তেমন ছিল না পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত, পুরাণকথা, ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন কি, যে সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায়-প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে।......বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

......এমনি কতকাল চলেছে দেশে; বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুবপ্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশচন্দ্রের সর্ব্বস্বত্যাগ। তখন

দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার এমন একটি প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে।......

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোন আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃ সঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্ত চলাচল হয় সর্ব্বদেহে।

তারপরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিত সমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো বা করুণকণ্ঠে কখনো বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এদিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রূপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহত হল ছোট ছোট কেন্দ্রে।

একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুসঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মত। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেন্‌ড্, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজী পড়া মুখস্থ করলেন, শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেইদিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখা শীতলা; সেইখানে মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে এতবড় বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায়

প্রাথমিক শিক্ষার যে যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষা-বিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতার সে সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জলছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছিনে এর মারমূর্তি।

মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে যে সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালিচাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এক কালে সে সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি, গবাক্ষলন্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডুস ভর্তি করতে হয়। নানা নিয়মে, তার আটঘাট বাঁধা।

মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজুটের মধ্যে বিশেষভাবে; তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্যজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে। বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে

ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চারদিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই নয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট্‌বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল না বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে এ কালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ওপার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্‌ঘাটন করেছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে মন, যে মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্বযুগান্তরে, আর যে মন রসসম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেষণ: যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তি ও আছে। বটগাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্ত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত মিলে তার কর্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ষ।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে; দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে, এ জন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দুর্লভ হল। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন করে করা যেতে পারে? তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটি পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশ কালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সে রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখি নে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলা ভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোন কালেই বাংলা-সাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্য অগত্যা যদি ইংরেজী ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলা ভাষাই জানে শিক্ষিত সমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা' জানিনে বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয়, 'শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এদিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষারক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়।

এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে। বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ী পরালে প্রেসটিজ-হানি হত। শিক্ষা সরস্বতীকে শাড়ি পরালে যে, আজও অনেক বাঙ্গালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতায় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা। ... ...। ... ...

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি; 'তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দ ধ্বনি।'

॥ দুই ॥

গত নভেম্বর, ১৯৭৩ সালে পেট্রোলের দাম হঠাৎ লিটার প্রতি ১·০৭ পয়সা করে বেড়ে যায়। এই হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির ফলে প্রচুর আলোচনা হয়। সেই সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকায় (২০।১১।৭৪) সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটা আলোচনা প্রকাশ হয় 'জ্বালানি লইয়া নানা কথার জ্বালা' এই নামে আলোচনাটি আধুনিক সমস্যা সমন্বিত আলোচনার একটি উদাহরণ।

জ্বালানি লইয়া নানা কথায় জ্বালা

রাস্তার কল বেওয়ারিশ, প্রায়ই দেখা যায় সেগুলির মুখ খোলা, অবিরল ধারায় জল পড়িয়া চলিয়াছে তো চলিয়াছেই। কিন্তু যাঁহারা রাজনীতিজিবী তাঁহাদের তো কিছুতেই বেওয়ারিশ বলা চলে না, বলিলে মানহানি হয়। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা আবার মন্ত্রী তাঁহারা তো দস্তুরমতো মাননীয়—মার্ক অ্যান্টনির ভাষায় "অনারেবল মেন"। তাঁহাদেরও কিন্তু মুখ খোলাই থাকে, ঝর্ঝর ধারে কথার ধারা ঝরিয়াই যায়। তাহা লইয়াও বলার কিছু নাই, কেননা ধরিয়া লইতেছি বাক্যের বেসাতি এই মহোদয়গণের জীবিকার একটা উপায় ও অঙ্গ। নহিলে ব্যবসা চলে না, মান-ইজ্জত লইয়া টান পড়ে; তবে সরলমতি

সাধারণ লোকের আরও সুবিধা হইত; যদি "বক্তিয়ারখিলজিদের" সব কথার মধ্যে সঙ্গতি থাকিত।

হালি ল একটা দৃষ্টান্ত জ্বালানি, তেল ইত্যাদি লইয়া বয়ানের পর বয়ান। ঘরের কেরোসিন আর গাড়ির ডিজেল-পেটরোল লইয়া গত কয়েকদিন যাবৎ কুতুবমিনারের চূড়া হইতে যত ঘোষণা শোনা গেল, সত্য কথা বলিতে কী, তাহার বেশির ভাগেরই মানে বোঝা যায় নাই। "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"—এই বিখ্যাত পদ্যটার কলি বারবার আওড়াইয়াও ব্যাখ্যার থৈ পাওয়া দুষ্কর। সাফাই তো আরও দূর অস্ত। মনে হয় যাঁহারা দায়ভাগী তাঁহারা তেমন দায়িত্বশীল নন। যেমন সরকারী মুখপাত্রেরা যদি বলিতেন আরবেরা কব্জা টিপিয়াছে বলিয়াই প্রায় সারা দুনিয়াতেই আজ তৈল সঙ্কট, এবং সেই সঙ্কটের ছাপ লাগিয়াছে ভারতেও তবে লোকের কষ্টের লাঘব না হউক, অবস্থাটার অর্থ বুঝিতে কষ্ট ছিল না। তেলের চাবিকাঠি যাহাদের হাতে তাহারা উৎপাদন, জোগান দুই-ই কমাইয়াছে বা কমাইতেছে এই উক্তি ও যুক্তিটা অন্তত অকপট হইত।

অথচ সরকারী মুখপাত্রেরা ও সোজা রাস্তাটা ছাড়িয়া বাঁকা ব্যাখ্যা আর সাফাইয়ের পথ ধরিলেন। বিশেষ করিয়া সৌদি আরব যে শত্রুমিত্র ভেদ করে নাই কথাটা মর্মান্তিক হইলেও প্রকৃত চিত্রটি তুলিয়া ধরিত। লোকেও বুঝিত। বুঝিত, যে নীতিটা সমদর্শী, সেখানে সকলেই সমান। কিন্তু কখনও আরব লীগ নামে অস্থিমজ্জাহীন একটা সংস্থার দোহাই পাড়িয়া কখনও বা আরব প্রতিনিধির মাভৈঃ বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া কর্তৃপক্ষ কতটা যে উল্টা-পাল্টা গাওনা গাহিয়াছেন তা বোধহয় তাঁহারাও টের পান নাই।

জল জ্যান্ত প্রমাণ, আরব প্রতিনিধির আশ্বাসের পরেও বিস্তর দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু সৌদি আরব যে ছাঁটাই তেল আবার পূরণ করিয়া দিবে, এই প্রয়োজনীয় আশ্বাসটি সেই দেশ হইতে এই দেশের গভর্নমেণ্টকে অদ্যাবধি জানানো হয় নাই। অতএব স্বতঃই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে ব্যাপারটা ন যযৌ দশায় স্থির হইয়া আছে। মিথ্যা বোঝানোর লজ্জায় কোথায় মুখপাত্রদের মাথা কাটা যাইবে, সে তো দূরের কথা "ভুল করিয়াছিলাম, ভুল ভাঙ্গিয়াছে" এই সৎ স্বীকৃতিটাও কেহ মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করেন নাই। ওদিকে নাকি ইউরোপে তেল পাঠানোর ব্যাপারে কঠিন আরবমুঠি শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় এজমালী বাজারের প্রেমকে তাহারা পুরস্কৃত করিতেছে বোঝা গেল। এমন কী প্রেসিডেন্ট নিকসনও এখন বলিতেছেন, আমেরিকা সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা সেটাও অচিরে তুলিয়া লওয়া হইবে বলিয়া তাঁহার আশা আছে। সবই ভাল, খালি ভারত কেন এখনও ব্ল্যাকলিসটে পড়িয়া রহিল সেই রহস্যটা কেহ বুঝাইয়া বলিল না। সম্পর্কটাকে সরস রাখিতেও তো কিঞ্চিৎ তেল চাই! সেখানেও যদি জোগানে ঘাটতি পড়ে তবে

সম্পর্কটারই শুকনা কলকব্জা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া উঠিবে যে! পাকিস্তান তলেতলে কোথাও কলকাঠি নাড়িতেছে কিনা সেটাও তল্লাস করিয়া দেখা দরকার।

সরকারী কর্তৃপক্ষ তাহার ধারকাছ দিয়াও যাইতেছেন না। একটা অর্থনৈতিক নীতিকে রাজনৈতিক চালে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করিলে যে অঘটন ঘটে, নিত্যনূতন সরকারী বয়ানে সেই আত্মগুন, সেই করুণ এবং হাস্যকর ছবিটাই প্রকট হইয়া উঠিতেছে। পেটরোলের ব্যবহার কমানোই যদি সরকারী নীতি, সেটা স্পষ্টাস্পষ্ট বলিয়া দিলেই তো গোল চুকিয়া যায়। তাহা হইলে আর আরব উৎস হইতে সরবরাহের গোলমেলে প্রশ্নটা কেহ তোলে না, সরকারকেও "আহা, উহারা কত দয়ালু, আমাদের সঙ্গে উহাদের কত দোস্তি", এই ধরণের দাবির ফিরিস্তি দাখিল করিতে হয় না। যে জিনিসের ব্যবহার বহুলভাবে ছাঁটাই করাই সরকারী নীতি, সেই জিনিসের সরবরাহে জোগানদারেরা ঘা মারে নাই, কথাটা সত্য হইলেও শ্রীশ্রীমন্ত্রী উবাচ্ উদ্‌গীত কথামালায় একেবারেই অবান্তর। হায়, এই সোজা কথাটা চোখে আঙুল দিয়া দেখানোর মতো কেহ নাই।

অনিবার্য ফল, একটি গল্‌তি ঢাকা দিতে আর দশটি যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন বিবৃতি। আমার এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর হইতে সদ্য সদ্য প্রচারিত বিবৃতিটিকে নমুনা হিসাবে লইতেছি। ওই বিবৃতিতে ঢালাও ফরমান জারী করা হইয়াছে যে, "পেটরোল দরকারী কোনও পণ্য নহে, বিশেষ করিয়া ভারতে"। একটা গোটা শিল্প তাহার হাজার হাজার কর্মী লইয়া যেখানে সরকারী হুকুমনামায় হঠাৎ অথৈ জলে হাবুডুবু খাইতে শুরু করিয়াছে, তখনও সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই ধরনের উচ্চকণ্ঠ আত্মতুষ্টি—নির্লজ্জতার চরম। চোখ এবং কানের মাথা না খাইলে এমন বেপরোয়া গলাবাজি সম্ভব নয়। গরু ঘোড়া লাগে খালি চাষের কাজে—পিছাইয়া থাকা দেশ বলিয়া এইটুকু লোকে মানিতে রাজী ছিল। কিন্তু রাতারাতি নব বিধানের মহিমায় সেই গোযানের যুগ যেন সর্বত্র ফিরিয়া আসিল। সেই সঙ্গে বৈদ্যুতিক অশ্বশক্তির বদলে সনাতন অশ্বশক্তির। সে সব না হয় মান্য এবং গণ্য ব্যক্তিদের স্টান্ট সংবাদ আর সরকারী দফতরের চত্বরে চমক লাগানো। সাধারণ মানুষই বা হার মানিবে কেন? তাহারা পত্রপাঠ উত্তর দিল পরিবহন হিসাবে, ঝাঁকে ঝাঁকে সাইকেল তো ছিলই, উপরন্তু ঝাঁকা মুটে আর ঠেলাগাড়ি ফের চালু করিয়া। এ সবের তাৎপর্য শুধুই হাসির নয়, গূঢ়তর ইঙ্গিতও আছে। কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদের সেই গূঢ়, গভীর দিকটার পাঠ লইতে পারেন নাই। এখনও তাই হাল্‌কা চালে খামখেয়ালির পালাটাই বহাল আছে। তাই আজ যদি খবর বাহির হয়,

জ্বালানির অভাবে দেশে বিমান চলাচল ব্যাহত হইতে চলিয়াছে, পরদিন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ওঠেন "দূর ! কে বলিয়াছে ?" দেশে যদি বিমান চালানোর জ্বালানির স্টক যথেষ্টই থাকে, তাহা হইলে ঠিক তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন কেন যে ভারতীয় বিমান সংস্থাকে জরুরী পরিস্থিতির জন্য তৈয়ার থাকিতে বলা হইয়াছে ? হয়তো তিনি সত্য কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু দুইটা সত্যের সহ-অবস্থিতি কী করিয়া সম্ভব, সামান্য মানুষেরা সরকারী বাত-সাফাইয়ে থৈ খুঁজিয়া না পাইবা তাজ্জব বনিয়াছে। আবার আরব দেশ হইতে তেলের জোগান যদি অফুরণ, তবে রেশনিং-এর কথাই বা কেন ; আমদানি হারের শাকের উপর শুল্ক নামক বোঝার আঁটি চাপান কেন—এ সব প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা তো নিরুত্তর রহিয়াছেই। সরকারী তরফের বাচালতা, আত্মখণ্ডন তথা স্ববিরোধিতা শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের বিবিধ ব্যাখ্যা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার ভিতে গিয়া আঘাত হানিতে পারে—কর্তৃপক্ষের পক্ষে সেই অস্বস্তিকর সম্ভাবনার কথা সমঝাইয়া দেখার সময় আসিয়াছে।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আলোচনা কর :—

১। খাদ্য সমস্যা ও উহার সমাধানের উপায়।

নির্দেশ : (ক) ভারতের লোকসংখ্যা কত ?

(খ) কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ?

(গ) বর্তমানে কত খাদ্য উৎপাদিত হয়।

(ঘ) আবাদী ও অনাবাদী জমির পরিমাণ কত ?

(ঙ) জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে আরও কত বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।

(চ) উন্নত চাষ প্রথা, ভাল সার, উপযুক্ত সেচকার্য।

২। বেকার সমস্যা ও উহার সমাধানের উপায়।

নির্দেশ : (ক) ভারতীয় জনসংখ্যার কত অংশ বেকার ?

(খ) শিক্ষিত বেকার ও অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত ?

(গ) শিল্প সম্প্রসারণের দ্বারা কতজন বেকারকে কাজে লাগানো যাবে ?

(ঘ) কৃষিক্ষেত্রে সম্প্রসারণ দ্বারা কতজন বেকারকে কাজে লাগানো যাবে ?

(ঙ) ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে সর্বক্ষেত্রেই, যথা—শিক্ষা, কুটির শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্প্রসারণের সুযোগ কি প্রকার ?

৩। মাতৃভাষাই শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

৪। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থান এত নীচে কেন? উহা উন্নত করিবার উপায়।

৫। মূল্যবৃদ্ধি ও উহা প্রতিকারের উপায়।

৬। সমাজে ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রতিকারের উপায়।

৭। সিনেমার সুফল ও কুফল।

৮। কলিকাতার যানবাহন সমস্যা।

৯। জীবনে নিয়মানুবর্তিতার আবশ্যকতা।

১০। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় জীবনে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

১১। ধর্ম ভারতের প্রাণ।

১২। ইতিহাস মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

পাঁচ

॥ আবৃত্তি ॥

কবিতা ভাল করে বুঝতে হলে যথাযথভাবে আবৃত্তি করা প্রয়োজন। ভাল করে পড়বার নামই ভাল করে বুঝা। কারণ, কবিতার ভাবই আসল এবং সেইভাব আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। কবিতা আবৃত্তির সময় শুধু কথার অর্থই নয়, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং ভাবের গভীরতা অন্তরে গেঁথে নিতে হয়। অর্থাৎ কবিতার ভাষা এবং ভাব, উভয়ের সৌন্দর্য বুঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু কবিতা কাকে বলে? প্রকৃতির নানা দৃশ্য, মানব-জীবনের বিভিন্ন ঘটনা কবির অন্তরে একটা ভাবের উদ্রেক করে; তিনি সেই ভাবকে প্রত্যক্ষ, সুন্দর, মধুর করে ছন্দোবদ্ধ পদে প্রকাশ করেন। এই ছন্দোবদ্ধ পদকে 'কবিতা' বলে। এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে গদ্য কবিতারও একটা ছন্দ আছে, ব্যঞ্জনা আছে, তাই তার নাম গদ্য-কবিতা। যেমন সব গদ্য কবিতা নয়, তেমন সব ছন্দোবদ্ধ পদই কবিতা নয়। ছন্দোবদ্ধ পদকে আমরা পদ্য বলি। কবিতা হতে হলে শুধু ছন্দোবদ্ধ পদ হলেই চলবে না, সেখানে ভাবের সুষমা, শব্দের ব্যঞ্জনা, ধ্বনির ঝঙ্কার থাকা চাই।

সাধারণ ভাষায় আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। কিন্তু শুধু মনের ভাবকে প্রকাশ করেই মানুষ তৃপ্ত হয় না। সে চায় তার ভাবকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে। তার ভাবানুভূতি শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে ভাষাকে সে করে, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, ভাবকে ধ্বনি ঝংকারে করে অলংকৃত।

কাব্য শুধু রস সাহিত্য নয়, তা রূপ সাহিত্য। সাধারণত ভাষায় সবগুলি অর্থবহন করে, কিন্তু ছন্দে তারা রূপগ্রহণ করে। তাই কাব্যের মধ্যে ছন্দের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মানুষের আদিম কাব্য ছন্দের ধ্বনিস্পন্দনের মধ্যেই রূপায়িত।

সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যেমন, তেমন পদ্যের মধ্যেও সমগ্র বা আংশিক অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য ধ্বনিপ্রবাহে যে উচ্চারণ বিরতি হয়, তাকে বলা হয় **ছেদ** বা অর্ধ-যতি।

কোন বাক্য পড়বার সময় শ্বাসগ্রহণের জন্য সুপরিকল্পিত কালান্তরে যে উচ্চারণ বিরতি আবশ্যক হয়, তাকে **যতি** বা ছন্দ-যতি বলে।

সাতকোটি সন্তানেরে | হে মুগ্ধা জননী ॥
রেখেছ বাঙালী করে | মানুষ করনি ॥

অল্পক্ষণস্থায়ী বিরামকে **অর্ধ-যতি** এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী বিরামকে **পূর্ণযতি** বলে।

অর্ধ-যতি বা ছেদ বাক্যকে অর্থানুযায়ী এবং ছন্দ-যতি বাক্যকে সুপরিকল্পিত ছক অনুযায়ী বিভক্ত করে।

হ্রস্বযতি থেকে আর এক হ্রস্বযতি পর্যন্ত বাক্যের যে অংশ তাকে পর্ব বলে।

বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য পর্ব ও যতির উপর নির্ভর করে।

বাংলা কবিতা পড়বার সময় বাঙ্‌লা ছন্দের তিন রকম ঢঙ লক্ষ্য করা যায়।

কবিতা পড়বার সময় সাধারণতঃ একটা টান বা সুর আসে—একে বলা হয় **তান**। আবৃত্তি করবার সময় যে ছন্দের পরিশেষে শব্দ-ধ্বনির অতিরিক্ত একটা তান থাকে, তাকে অক্ষরবৃত্ত বা তান-প্রধান ছন্দ বলে। তান-প্রধান ধীর লয়ের ছন্দ।

যেমন :— নির্মল তরুণ উষা | শীতল সমীর ॥
শিহরি শিহরি উঠে | শান্ত নদী নীর ॥

আবৃত্তি পড়বার সময় যে ছন্দে কোন টান থাকে না, অর্থাৎ শব্দ-ধ্বনির অতিরিক্ত কোন সুর বা তান থাকে না, তাকে বলা হয় মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনি-প্রধান ছন্দ। ধ্বনি-প্রধান মধ্যম লয়ের ছন্দ।

যেমন :— হৃদয় আজি মোর | কেমনে গেল খুলি ॥
জগৎ আসি সেথা | করিছে কোলাকুলি ॥

আর এক ধরনের ছন্দ আছে যেখানে প্রতি পর্বের প্রথমে একটি ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত (বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণে সুস্পষ্ট জোর দেওয়া) থাকে। তাকে বলা হয় স্বরবৃত্ত বা **শ্বাসাঘাত** প্রধান ছন্দ। ছড়ার ছন্দ এই শ্রেণীভুক্ত। শ্বাসাঘাত প্রধান দ্রুত লয়ের ছন্দ।

যেমন :— ´রাত পোহালো | ´ফরসা হলো | ´ফুটল কত | ´ফুল ॥
´কাঁপিয়ে পাতা | ´নীল পতাকা | ´জুটলো অলি | ´কুল ॥

যেখানে পর পর দুটি চরণের শেষে অথবা পর পর চরণের পর্বে মিল থাকে, তাকে বলা হয় **মিত্রাক্ষর**।

যেমন :— মহাভারতের কথা | অমৃত **সমান** ॥
কাশীরাম কহে | শুনে পুণ্য**বান** ॥

[সঙ্কেত চিহ্ন :—অর্ধযতি। পূর্ণযতি ॥]
উপচ্ছেদ * পূর্ণচ্ছেদ **
| শ্বাসাঘাত

বাংলা পুরানো ছন্দের মধ্যে প্রধান—'পয়ার' ও 'ত্রিপদী'। ইহার প্রত্যেক লাইনে ১৪ অক্ষর আছে, ৮ অক্ষর পরে একটি ছেদ আছে।

পয়ার ছন্দে দুটি চরণ এবং প্রতি-চরণে দুটি পর্ব থাকে। চরণ দুটি পরস্পর মিত্রাক্ষর হয়। এখানে প্রতি-চরনের শেষে ভাবের আংশিক বা সামগ্রিক পরিসমাপ্তি ঘটে।

যেমন :— বন হতে এলো এক | টিয়ে মনোহর ॥
সোনার টোপর শোভে | মাথার উপর ॥

ত্রিপদী ছন্দে প্রতি-চরণে তিনটি পর্ব থাকে ; এখানে দুটি চরণ মিত্রাক্ষর এবং প্রতি-চরণের প্রথম দুটি পর্বও মিত্রাক্ষর। ত্রিপদীতে দুইটি ছেদ ও তিনটি পদ থাকে। যেমন :—

(১) সুখের লাগিয়া | এ ঘর বাঁধিনু |
অনলে পুড়িয়া গেল ॥
অমিয় সাগরে | সিনান্ করিলে |
সকলি গরল ভেল ॥

(২) আশ্বিনের মাঝামাঝি | উঠিল বাজনা বাজি |
পুজার সময় এলো কাছে ॥
মধু বিধু দুই ভাই | ছুটাছুটি করে তাই |
আনন্দে দু-হাত তুলি নাচে ॥

চৌপদীতে প্রতি চরণে চারটি পর্ব থাকে ; দুটি চরণে মিত্রাক্ষর এবং প্রথম তিনটি পর্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর। যেমন :—

(১) চির সুখী জন | ভ্রমে কি কখন | ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে | কভু আশীবিষে | দংশেনি যারে।

(২) একদিন দেব | তরুণ তপন—
হেরিলেন সুর | নদীর জলে ॥
অপরূপ এক | কুমারী রতন—
খেলা করে নীল | নলিনী দলে ॥

অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ার ছন্দের আদর্শে রচিত হলেও এই ছন্দের নিজস্বতা আছে। পয়ার ছন্দের প্রতি-চরণে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে, দুই চরণের মধ্যে মিল দিতে হয়। কিন্তু চরণ থেকে চরণান্তরে ভাবের প্রবাহকে বহন করে নিয়ে যাওয়া অমিত্রাক্ষরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে একটি ভাব প্রথম চরণে শেষ না হয়ে পরবর্তী চরণে প্রকৃত হয়। এই প্রবহমানতা (অর্থাৎ ছেদ ব্যবহারে স্বাধীনতা) অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যেমন ঃ—তুমি আইস দেবি * | তুমি মধুকরী ॥
কল্পনা | ** কবির চিত্ত | ফুলবন মধু ॥
লয়ে রচ মধুচক্র | ** | গৌড়জন যাহে* |
আনন্দে করিবে পান | সুধা নিরবধি |

অমিত্রাক্ষর, অর্থাৎ মিলহীন পয়ার। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ারের মত পড়লে চলবে না। লাইনের শেষে না থেমে যেখানে বাক্য শেষ হচ্ছে সেখানে থামতে হবে। বাক্যের অংশগুলোও অর্থ অনুযায়ী একটু আলাদা করে পড়তে হবে। তাহলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা আবৃত্তি করা যাবে।

'পয়ার' 'মিত্রাক্ষর' 'ত্রিপদী' ছন্দের কবিতা আবৃত্তি করতে হলে একটু সুর সংযোগ করে আবৃত্তি করতে হ'বে। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ আজও আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় শোনা যায়। দেখা যাবে সেখানে সুর করে পাঠ করা হচ্ছে। তার কারণ ঐসব ছন্দের কবিতা সুর ছাড়া শুনতে ভাল লাগে না।

অন্যান্য ছন্দের কবিতা আবৃত্তি করার আগে কয়েকবার বেশ ভাল করে পড়ে নিতে হবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ভাব এবং অর্থও বুঝতে হ'বে। কারণ কবিতার অর্থ সঠিকভাবে না বুঝলে কবিতা আবৃত্তি করা যায় না। আর একটা কাজ করতে হ'বে। আবৃত্তি করার আগে কবিতাটা মুখস্থ করে নিতে হবে। কবিতাটা ভাল করে কয়েকবার পড়ার পরে এইবার ধীরে ধীরে আবৃত্তি করা শুরু করতে হবে। কোথাও থেমে থেমে পড়তে হবে, কোথাও দ্রুত উচ্চারণ করতে হ'বে, কোথাও নীচু স্বরে, কোথাও বা স্বরগ্রাম উচ্চে তুলতে হ'বে। যেখানে হতাশা, বিষাদ প্রভৃতি ভাব থাকে সেখানে ধীরে, স্বরকে নীচে নামিয়ে বলতে হবে। যেখানে উল্লাস, আনন্দ, সেখানে একটু দ্রুত লয়ে একটু জোরে উচ্চারণ করা দরকার। কিন্তু যেখানে ক্রোধ, উষ্মা সেখানে সাধারণতঃ স্বরগ্রাম উঁচুতে তুলে, বেশ জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে। মোটামুটি এই নিয়ম অনুসরণ করে যাঁরা ভাল আবৃত্তি করেন তাঁদের আবৃত্তি শুনে ভাল আবৃত্তি করা শেখা যায়।

ছাত্রদের প্রতি ঃ—

কবিতা আবৃত্তি করতে হ'লে ছন্দ সম্পর্কে একটু জানা থাকা দরকার। ছন্দ বলতে একরকম মাপ বোঝায়। অক্ষর গুণে গুণে কবিতার ছন্দের মাপ হয়। কবিতার এক একটি লাইনকে 'চরণ' বলে ; প্রত্যেক চরণের এইরূপ মাপ থাকে, যথা—১০, ১২, ১৪,

১৮, ২২ অক্ষরের চরণ। অক্ষর গণিবার সময় যুক্ত অক্ষরকে দুই অক্ষর ধরিতে হইবে—যদি তাহা শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকে, যেমন 'নন্দপুর' চার অক্ষর নয়, পাঁচ অক্ষর।

আবৃত্তি করতে হ'লে মাত্রা সম্পর্কেও একটু জানা দরকার। প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ কাল এক এক মাত্রা; এখানে অক্ষর অর্থ স্বরান্ত বর্ণ; যদি তার পরে কোন যুক্ত অক্ষর থাকে বা অ-কার, এ-কার প্রভৃতি দীর্ঘস্বর যুক্ত থাকে, তবে সেই অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরতে হ'বে। পড়বার সময় ঐ দুই-মাত্রার অক্ষরগুলি টেনে টেনে উচ্চারণ করতে হ'বে। উদাহরণ:

জনগণ মন | অধিনায়ক | জয়হে |
| ভারত ভাগ্য | বিধাতা।

'—' মাত্রা থাকার অর্থ একটু টেনে উচ্চারণ করা।

আবৃত্তি করার একটি বিশেষ উপকারী দিক আছে। আবৃত্তির মাধ্যমে মনঃসংযোগ করা সহজ হয়। ছন্দোবদ্ধ পদ সুললিত স্বরে, স্পষ্ট উচ্চারণ আবৃত্তি করতে পারলে মন আপনা থেকেই শান্ত হয়ে আসে। শান্ত, ধীর, স্থির মানসিক পরিবেশ মনঃসংযোগের অনুকূল।

আবৃত্তির প্রচলন ভারতবর্ষে বহুদিন থেকেই চলে আসছে। সকালবেলা উঠে মন্ত্র পাঠ, স্তোত্র পাঠ আবৃত্তিরই নামান্তর। সমগ্র সামবেদটাতো আবৃত্তি ও সংগীতের মাধ্যমেই পাঠ করতে হয়। যে কোন ছন্দোবদ্ধ পদ সাধারণভাবে পড়লে শুনতে মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু তাতে একটু সুর, একটু ধ্বনি, ঝঙ্কার যদি থাকে, যদি তাল ও মাত্রা ঠিক রেখে স্পষ্ট উচ্চারণে আবৃত্তি করা যায় তাহলে শুনতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

রোজ সকালবেলা উঠে প্রথমেই যদি কিছু ছন্দোবদ্ধ পদ আবৃত্তি করা যায়—সে মন্ত্রই হোক বা কবিতাই হোক—তাতে উপকার হবে। প্রথমতঃ কোন কাজে মনঃসংযোগ করা সহজ হবে। দ্বিতীয়তঃ যাহাই আবৃত্তি করি না কেন সেটা মুখস্থ হবে। ফলে মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। অবশ্য যাই করি না কেন, অর্থটা ভাল করে বুঝে তবেই আবৃত্তি করতে হ'বে।

আবৃত্তি সুন্দর করে করা দরকার। যাঁরা ভাল আবৃত্তি করেন, তাঁদের আবৃত্তি শুনতে হবে। তাঁদের আবৃত্তি থেকে বুঝতে পারা যাবে—গম্ভীর ভাবের জন্য কিভাবে স্বর নিক্ষেপ করতে হবে, ক্রোধ প্রকাশের জন্য স্বরগ্রাম কতটা উঁচু করা দরকার; অর্থাৎ মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের সমস্ত কায়দাটা তাঁদের আবৃত্তি থেকে শেখা যাবে আর জানা যাবে পদের সঠিক উচ্চারণ ও বাচন ভঙ্গী।

উদাহরণ ঃ—

॥ এক ॥

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।

চণ্ডীপাঠ করি রাম | করিল উৎসব।
গীত-নাট করি জয় | দেয় কপি সব ॥
প্রেমানন্দে নাচে আর দেবী-গুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চনে দিবাকর অস্ত যায় ॥
সায়াহ্ন কালেতে রাম করিল বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্বাবধ বাসন ॥
আপনি গড়িলেন রাম মূর্তি মৃন্ময়ী।
হইতে সংগ্রামে দুষ্ট রাবণ বিজয়ী ॥
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নব-বৃক্ষের বিলাস ॥
এইরূপে উদযোগ করিয়া দ্রব্য যত।
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত ॥
অসাধ্য সুসাধ্য তার নাহি অনুমান।
ত্রিভুবনে ভ্রমিয়া আনিল হনুমান ॥
গত হৈল ষষ্ঠী নিশা, দিবা সুপ্রভাত।
উদয় হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ ॥

(কৃত্তিবাসী-রামায়ণ)

(এই কবিতাটি পয়ার ছন্দ অর্থাৎ মিত্রাক্ষর ছন্দ প্রধান।)

॥ দুই ॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব।

ক্রোধ করি কর্ণবীর | প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চলি যায় | কুতূহলি মনে ॥
প্রবেশিয়া কর্ণবীর করে মহারণ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণ ॥

সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে।
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে ॥
কর্ণপুত্রে নাশিকাটে কৃপাচার্য্য-ধনু।
তিন বাণে বিন্ধিলেক দুঃশাসন-তনু ॥
ছয়বাণে শকুনিরে কৈল জর জর।
রথ-কাটি উলূকেরে বিন্ধে তারপর ॥
থাক থাক শুষেণ কাটিব তোর শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর ॥ (মহাভারত ; কর্ণ-পর্ব)

[প্রথম দুই চরণে ছেদ এবং যতি চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হ'ল। এই রকম পয়ার ছন্দ বা মিত্রাক্ষর ছন্দ প্রধান যে কোন কবিতাই আবৃত্তি করতে হ'লে এই নিয়ম মত করবে।)

॥ তিন ॥

হে বঙ্গ,* ভাণ্ডারে তব | বিবিধ রতন :—* ॥
তা সবে (অবোধ আমি !) | অবহেলা করি,* ॥
পর ধন লোভে মত্ত,* | করিনু ভ্রমণ ॥
পরদেশে,* ভিক্ষাবৃত্তি | কুক্ষণে আচরি** ॥
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

(বঙ্গভাষা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

॥ চার ॥

"এতক্ষণে"*—অরিন্দম কহিলা বিষাদে* ॥
"জানিনু কেমনে আসি | লক্ষ্মণ পশিল ॥
রক্ষঃপুরে** ! হায়,* তাত, | উচিত কি তব ॥
এ কাজ,* নিকষা সতী | তোমার জননী,* ॥
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ! | শূলীশম্ভুনিভ ॥
কুম্ভকর্ণ** ? ভ্রাতুষ্পুত্র | বাসববিজয়ী !** ॥
নিজ গৃহ পথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন -ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ, বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্ ! রাঘব দাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব; রক্ষিতে
অনুরোধ ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি ;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধিরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু পঙ্কিল সলিলে
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে হে বীর কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে

মিত্র ভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে ?
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?"

(মেঘনাদবধ—ষষ্ঠ সর্গের অংশ বিশেষ—মাইকেল মধুসূদন)

পাঁচ

রেখো, মা,* দাসেরে মনে,* | এ মিনতি করি পদে**। ॥
সাধিতে মনের সাধ,* | ঘটে যদি পরমাদ,* ॥
মধুহীন করো না গো | তব মনঃ কোকনদে।**
প্রবাসে দৈবের বশে | জীব তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন :—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে।
(বঙ্গভুমির প্রতি—মধুসূদন দত্ত)

'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ প্রধান কবিতা দেখানো হো'ল। কোন চরণে অর্থ এবং যতি ও ছেদ অনুসারে থামতে হবে তাহা আরও বিশেষ ভাবে দেখিয়ে দেওয়া হোল। নিয়মগুলি অবশ্যই মানতে হবে ; না হলে অর্থ পরিস্ফুট হবে না।

॥ ছয় ॥

[কবির গভীর এবং নিবিড় মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত সনেটটিতে।

মরিতে চাহিনা আমি | সুন্দর ভুবনে, ।
মানবের মাঝে আমি | বাঁচিবারে চাই ॥
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !
ধরায় প্রাণের খেলা চির, তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যতকাল

তোমাদেরই মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়॥

('প্রাণ'—কড়ি ও কোমল ; রবীন্দ্রনাথ।)

॥ সাত ॥

গগনে গরজে মেঘ, | ঘন বরষা ॥
কূলে একা বসে আছি, | নাহি ভরসা ॥
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসী মাখা
গ্রাম খানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা ॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে !
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়, কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু ধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ॥

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে ?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥

যত চাও তত লও তরণী 'পরে।
আর আছে ?—আর নাই, দিয়েছি ভরে
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে ॥

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ-গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে, গেল সোনার তরী ॥ (সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ)

॥ আট ॥

[মঙ্গলময় বিশ্বদেবতার সমীপে কবি তাঁর লাঞ্ছিত স্বদেশ ভূমির জন্য কল্যাণ কামনা করেছেন, কুসংস্কার মুক্ত এক জ্ঞান দীপ্ত ভারতবর্ষের রূপকে আদর্শায়িত করেছেন।]

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ধারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

('প্রার্থনা'—'নৈবেদ্য'—রবীন্দ্রনাথ)

॥ নয় ॥

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধুলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়,
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চির চিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে ॥
সমুদ্র পারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পুজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা ॥

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষ কাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,

যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মান হারা মানবীর দ্বারে ;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।
(আফ্রিকা—শ্যামলী)—রবীন্দ্রনাথ

॥ দশ ॥

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা ॥
চিরযুবা তুই যে চিরজীবি,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছরিয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা।
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা ॥
(সবুজের অভিযান—বালাকা) রবীন্দ্রনাথ

॥ এগার ॥

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে,' বলে গেল 'ভালবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।'
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে ॥
আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে ;
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

(প্রশ্ন—পরিশেষ)—রবীন্দ্রনাথ

॥ বার ॥

যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি,
আমি তবে এক্ষনি হই ইচ্ছামতী নদী।
রইবে আমার দখিণ ধারে সূর্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে, সন্ধ্যেবেলায় জমবে অন্ধকার,
আমি কইব মনের কথা দুই পারেরই সাথে—
আধেক কথা দিনের বেলায়, আধেক কথা রাতে ॥

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই আপন গাঁয়ের ঘাটে
ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই দূরের মাঠে মাঠে।
গাঁয়ের মানুষ চিনি—যারা নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা সাঁৎরে ওপার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের নতুন তরো বেশ—
নাম জানিনে, গ্রাম জনিনে, অদ্ভুতের একশেষ ॥

(ইচ্ছামতী—শিশু ভোলানাথ)—রবীন্দ্রনাথ

॥ তের ॥

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজচ্ছত্র ভেঙে পড়ে ; রণ ডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে।
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে ;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ পরি।
ওরা কাজ করে
দেশ দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন—গুন গুন স্বর—
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখসুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।

(ওরা কাজ করে—আরোগ্য)—রবীন্দ্রনাথ

॥ চৌদ্দ ॥

কাজী নজরুল—

বল বীর—
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি আমার নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
বল বীর—
আমি চির উন্নত শির।

(বিদ্রোহী কবিতার একটি স্তবক)—কাজী নজরুল

॥ পনের ॥

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাকো মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

('আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার একটি স্তবক)—কাজী নজরুল

॥ ষোল ॥

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার ভাঙ্গা কল্লোলে !
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন
মুক্তি এলো আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আশে
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
('আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতার প্রথম দুই স্তবক)

সুকান্ত ভট্টাচার্য—

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়,
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ ললিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো !
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি (হে মহাজীবন)

প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র—

অগ্নি আখরে, আকাশে যাহারা লিখেচে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরঙ্গ জীবন মৃত্যু জুড়ে তারা উদাস,
দুয়েরি বাসা নাই ?
পৃথিবী বিশাল তারা জাগিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির,
প্রভঞ্জনের বিরাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির।
(সুদূরের আহ্বান—১ম ও ২য় স্তবক)

ভাড়াটে কুঠি !
নদীর স্রোতের জঞ্জালসম আসিয়া জুটি।
ওধারে তাহারা এধারে কাহারা ওপরে ও নীচে নানা ;
পাশাপাশি রোজ ঘর করি ভাই কেহ নয় কারো জানা !

শুধু হু'বেলায় চোখাচোখি হয় একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
ওধারের ঘরে তাহাদের ছেলে বুঝি বা ধুঁকিছে জ্বরে ;
এধারে প্রবাসী স্বামীটির লাগি বধুটি শুকায়ে মরে।
নীচে মজলিসে সারাদিন গোল চলিছে দাবার ঘুঁটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
একটি ইটের ব্যবধান রেখে পাশাপাশি থাকে শুয়ে,
এ ছাতের জল ও ছাতে গড়ায় ভিৎ গাড়া একই ভুঁয়ে ;
ওইখানে শেষ ; তার পরে আঁটা জানালা কবাট হুটি।
ভাড়াঠে কুঠি ॥
একদিন ফের ঘুর্ণিতে টানে, কোন্‌খানে যাই ভেসে ;
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায় নিয়ে বলি ম্লান হেসে।
যা ছিল আড়াল রহে চিরকাল বাধা নাহি যায় টুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
শুধু কোনদিন সঙ্গ-বিহীন বিদ্রোহ করে প্রাণ ;
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচেনা আড়াল, ব্যাকুল হৃদয় মিছে মরে মাথা কুটি ॥
ভাড়াটে কুঠি ॥

(ভাড়াটে কুঠি—প্রেমেন্দ্র মিত্র)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

মুক্ত বেণীর | গঙ্গা যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে
আমরা | বাঙ্গালী | বাস করি সেই | তীর্থে—বরদ | বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল ; ডাইনে মধুক মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুক ভরা, যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

(আমরা—১ম স্তবক)

ইল্‌শে গুঁড়ি !　　　ইল্‌শে গুঁড়ি
　　ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি　　　ইলশে গুঁড়ি
　　দিনের বেলায় হিম।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
　　আলতা-পাটি শিম্।
ইল্‌শে গুঁড়ি !　　　হিমের গুঁড়ি,
　　রোদ্দুরে রিম্‌ঝিম্।　　(ইল্‌শে গুঁড়ি—১ম স্তবক)

॥ * ॥

ওই　সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ।
ওই　চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ।
যার　উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিঃশ্বাস !
আর　উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !
ওই　শৈশব যার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর　'যৌবন তার সিংহে'র বশ,—সিংহের গায় জয়,
এই　বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর যার ছায় ;
আজো　বঙ্গের বীর 'সিংহের নাম অন্তর তার গায়।
(সিংহল—১ম, ২য় স্তবক)

॥ * ॥

কোন্ দেশেতে তরু লতা—
　　সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'লতে গেলেই—
　　দ'লতে হয় রে দুর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
　　সোনার কমল ফোটে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে।
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে নাচে গাছে গাছে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

(কোন্ দেশে—অংশ বিশেষ)

॥ * ॥

এসেছে নতুন শিশু, | তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ; ॥
জীর্ণ পৃথিবীতে | ব্যর্থ, মৃত আর | ধ্বংসস্তূপ পিঠে।
চলে যেতে হবে | আমাদের। ॥
চলে যাব—॥ তবু আজ | যতক্ষণ | দেহে আছে প্রাণ।
প্রাণ পণে | পৃথিবীর | সরাব জঞ্জাল, ॥
এ বিশ্বকে | এ শিশুর | বাসযোগ্য | করে যাব আমি ॥
নবজাতকের কাছে | এ আমার | দৃঢ় অঙ্গীকার। ॥
অবশেষে | সব কাজ সেরে, ॥
আমার | দেহের রক্তে | নতুন শিশুকে।
করে যাব | আশীর্বাদ, ॥
তারপর | হব ইতিহাস ॥

(ছাড়পত্র—সুকান্ত)

॥ * ॥

আমি এক | দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি | মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র হাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর-শৃঙ্খল দুই হাতে।
তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে ॥

('রবীন্দ্রনাথের প্রতি"—সুকান্ত)

॥ * ॥

... ...

শোন্ রে মালিক শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘর বাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলিতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।
তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতের কোনো যাদু ঘরে
নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রাণ হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।

... ...

('বোধন'—সুকান্ত)

॥ * ॥

...   .

হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
হে সূর্য !
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব !
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী ॥

(প্রার্থী—সুকান্ত)

॥ * ॥

সেদিন শারদ দিবা-অবসান,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্য-শীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি।
শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা,—
"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা,

শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে ?
সেথা হ'তে ফিরি' গেল চলি' ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সম্মুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সিঁথির সীমার পরে।
শ্রীমতীরে হেরি, বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল—"অবোধ, কি সাহস-বলে
এনেছিস পূজা এখনি যা চলে'
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তাহ'লে
বিষম বিপদপাত।"

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি' উঠিল শুনি কিঙ্কিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে !
শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমনি ক'রে কি মরণের পানে,
ছুটিয়া চলিতে আছে ?"

দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্য-থালি,
"হে পুর-বাসিনী !" সবে ডাকি কয়,

"হয়েছে প্রভুর পূজার সময় !"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।
দিবসের শেষ আলোক মিলা'ল
নগর-সৌধ' পরে।
পথ জনহীন-আঁধারে বিলীন
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতি-ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন,
রাজদেবালয় ঘরে।
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জলে।

('পূজারিণী'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

॥ * ॥

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইংগিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোর না পাখা।
... ...
ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহ বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোর না পাখা।

('দুঃসময়'—রবীন্দ্রনাথ)

ছয়

॥ কথোপকথন ॥

কথোপকথন (কথা+উপকথন) শব্দটির অর্থ হচ্ছে কথাবার্তা বলা। উপকথন শব্দের অর্থ প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা। যখনি আমরা কোন কথা বলি তখন সেটা নিশ্চয়ই কোন বিষয় সম্পর্কে। কিন্তু সেই বিষয়ে কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কিছু কথা এসে পড়ে তাই কথাবার্তা বোঝাতে কথোপকথন শব্দটা ব্যবহার করা হয়।

কথাবার্তা বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে হয়ে থাকে। কথা বলারও কিছু সাধারণ নিয়ম আছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলা, সমবয়সীদের সঙ্গে কথা বলা, অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে কথা বলা, কনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলা, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা প্রভৃতি কথাবার্তার জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম অবশ্যই মানতে হয়।

পরিচিত বা অপরিচিত, যাই হোক না কেন যেহেতু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেজন্য যখনই কারোর সঙ্গে আমরা কথা বলব, আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে যেন শ্রদ্ধা, বিনয়, ভদ্রতা অবশ্যই থাকে। এমনভাবে কোন কথা বলব না যাতে যাঁর সঙ্গে কথা বলছি, তাঁর আত্মসম্মানে বা মর্য্যাদায় আঘাত লাগে।

অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবার সময় সর্বদা 'আপনি' সম্বোধন করা উচিত। অপরিচিত কারুর সঙ্গে হয়তো কোন ব্যবসা বা কাজের ব্যাপারে দেখা করা দরকার। আগে থাকতে দেখা করার সময় নির্দিষ্ট করা আছে। দেখা করতে গিয়ে প্রথমেই যে সমস্যা দেখা দেয় সেটা কি দিয়ে কথা আরম্ভ করা যায়। এখানে নিয়ম হচ্ছে দেখা করতে গিয়ে প্রথমে নমস্কার জানাতে হয়। তারপরে নিজের নাম, পরিচয় এবং যে কাজের জন্য আসা সে কথা বলতে হয়। এভাবেই কথা সুরু করতে হয়। নীচে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

জনৈক শ্রীবসুর সঙ্গে শ্রীঘোষ দেখা করতে এসেছেন।

শ্রীঘোষ :—আসতে পারি ?

শ্রীবসু :—আসুন ; দয়া করে বসুন। বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি।

শ্রীঘোষ :—নমস্কার ; আমার নাম শ্রীঅমুকচন্দ্র ঘোষ। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি গতকাল ফোন করেছিলাম। আমাদের পাড়ায় ছোটদের জন্য একটা পার্ক করার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

শ্রীবসু : হাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনার প্রস্তাবটা খুবই ভালো। দেখুন এ ব্যাপারে আমার সক্রিয় সহযোগিতা পাবেন। বলুন এ ব্যাপারে কি করতে হবে।

ইত্যাদি ; ইত্যাদি ... ...

আবার অনেক সময় দেখা যায় কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি একই জায়গায় অনেকক্ষণ বসে আছেন। পরস্পর কথা শুরু করবেন কেমন করে? একজনকে কথা শুরু করতে হবে, তবে তো পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হবে। এই ব্যাপারে বহু প্রাচীনকাল থেকে কথাবার্তা শুরু করার একটা নিয়ম প্রচলিত আছে। নিয়মটা খুবই সুন্দর।

[উদাহরণ :

১ম ব্যক্তি : মহাশয়ের নামটা কি জানতে পারি ?

২য় ব্যক্তি : শ্রীঅমুকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার (নাম) ?

১ম ব্যক্তি : শ্রীঅমুকচন্দ্র হালদার। মহাশয়ের নিবাস ?

২য় ব্যক্তি : বাগবাজার। আপনার (বাড়ী) ?

১ম ব্যক্তি : গড়পার। বাগবাজারে কোথায় আপনার বাড়ী ?

২য় ব্যক্তি : বোসপাড়া লেনে। ৩৪নং বাড়ী।

১ম ব্যক্তি : আচ্ছা, আচ্ছা। কি করা হয় ?

২য় ব্যক্তি : এই, ছোট খাট ব্যবসা।

১ম ব্যক্তি : তাই নাকি ? আমারও ব্যবসা আছে। বেশ ভালই হ'ল পরিচয় হয়ে…ইত্যাদি…ইত্যাদি……]

এইভাবে আলাপের মাধ্যমে ক্রমশঃ পরিচয় হতে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। কথাবার্তা বলার উপরোক্ত কায়দাটা আজকাল অনেকে পছন্দ করেন না—সেকেলে বলে। কিন্তু মনে হয় নতুন করে পরিচয় করার ব্যাপারে উপরোক্ত ঢংটা খুবই নির্দোষ। এটাকে একটু আধুনিকীকরণ করে নেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ :

১ম ব্যক্তি : (২য় ব্যক্তির প্রতি) দেখুন অনেকক্ষণ একজায়গায় আমরা বসে আছি। কিন্তু এখনও আলাপ হল না। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা জানতে পারি। আমার নাম শ্রীঅমুকচন্দ্র ব্যানার্জী।

২য় ব্যক্তি : আমিও একই কথা ভাবছিলাম। ভালই হ'ল। আমার নাম শ্রীঅমুক চন্দ্র হালদার। তা আপনার কোথা থাকা হয়।

১ম ব্যক্তি : আমি গড়পাড়ে থাকি। ছোটখাট একটা লেদের কারখানা আছে। দেখুন না কিছু লোহা দরকার, পাচ্ছি না। তাই পারমিটের জন্য দরবার করতে এসেছি। তা, আপনি কোথায় থাকেন ?

২য় ব্যক্তি : আজ্ঞে, আমার বাড়ী, বাগবাজারে। আর বলবেন না ভাই। আমারও একই অবস্থা। একটা ছোটখাট ষ্টীল ফার্নিচারের কারখানা আছে। লোহার অভাবে কারখানা বন্ধ হতে বসেছে। ······ইত্যাদি······ইত্যাদি······]

উপরোক্ত কায়দায়ও আলাপ করা যায়, কথাবার্তা বলা যায়।

ধরা যাক ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। হাওড়া থেকে দিল্লী যাচ্ছে। কামরার অধিকাংশ যাত্রীই পরস্পরের অপরিচিত। কিন্তু দেখা যায় দিল্লী পৌঁছুবার আগেই পরস্পরের মধ্যে একটা পরিচয় হয়। কারো কারো মধ্যে একটা সাময়িক ঘনিষ্ঠতাও হয়। সেখানকার কথাবার্তা কিন্তু কোন বাঁধা নিয়মে চলে না। একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি।

১ম যাত্রী : আর পারা যায় না। কখন যে গাড়ীটা ছাড়বে। আধঘণ্টা হয়ে গেল ; যাত্রার শুরুতেই এই অবস্থা ভাবছি কি হাল হ'বে।

২য় যাত্রী : ঠিক বলেছেন দাদা। এখন নিয়মটাই অনিয়ম। সর্বত্র অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা। কেউ কাউকে মানতে চাইছে না।

৩য় যাত্রী : এরকম মন্তব্য করা ঠিক নয়। একটু খোঁজ নেওয়া দরকার কেন গাড়ী ছাড়তে দেরী হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল বা অসুবিধে দেখা দিয়েছে।

৪র্থ যাত্রী : জানি না মশাই কী ব্যাপার। বুঝিও না অতশত। প্ল্যাটফর্মে গাড়ী দিয়েছে। ইঞ্জিনও লেগে গিয়েছে। এখন অসুবিধেটা কোথায় ? আধঘণ্টা হয়ে গেল—রেলকর্তৃপক্ষ মাইকে কিছু বলবে তো—কখন ছাড়বে—কি ব্যাপার ?

১ম যাত্রী : তাহ'লেই হয়েছে। আমাদের কি ওরা (রেল কর্তৃপক্ষ) গ্রাহ্যের মধ্যে আনে ? পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে রেলে চড়েছি। কিন্তু ভাবটা দেখুন—রেলে চড়তে দিয়ে যেন ওরা আমাদের কৃতার্থ করে দিয়েছে।

২য় যাত্রী : আহা-হা—এতে অবাক হবার কিছু নেই। দেখছেন আমাদের হাল। পয়সা দিয়ে বেবীফুড কিনবেন—অথচ দোকানীর কাছে ধর্ণা, লাইন। দুধ, মাখন, চাল, ডাল, তেল সবই তো আমরা পয়সা দিয়ে কিনি। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কি ? যেন ভিক্ষে করছি।

৩য় যাত্রী : এরকম কঠোর মন্তব্য করাটা ঠিক নয়। দেশে লোক যত বেড়েছে— জিনিষের উৎপাদন তত বাড়েনি। তাই এত অভাব, অনটন। আর অভাব হ'লে এরকম অবস্থাই হয়।

৪র্থ যাত্রী : কি জানি দাদা—অভাবটা কোথায়? পয়সা দিলে সব মেলে— কালোবাজারে কোন জিনিষেরই অভাব নেই।

কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছিল ট্রেণ দেরিতে ছাড়া নিয়ে। সেখান থেকে মোড় নিয়েছে অন্য জায়গায়। কথাবার্তা যত চলতে থাকবে তত আরও নতুন নতুন বিষয়ে মন্তব্য— প্রতিমন্তব্য শোনা যাবে। এই রকম কথাবার্তার মাধ্যমে ট্রেণে যেতে যেতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হ'বে—কিছু কিছু ঘনিষ্ঠতাও হবে।

এবার আসা যাক ঘরোয়া কথাবার্তায়। পিতা, মাতা ও পরিবারের অন্যান্য গুরু-জনদের সঙ্গে কথাবার্তা কেমন করে বলা হত বা হয়। আগেকার দিনে পিতা মাতা বা অন্যান্য গুরুজনকে ছেলে মেয়েরা সব সময় 'আপনি' সম্বোধন করত। এমন কি স্ত্রীও স্বামীকে আপনি সম্বোধন করতেন। আজকের দিনে এটা ভাবাই যায় না। এখন ছেলে বাবাকে বা মাকে আপনি বলছে এটা খুব কমই শোনা যায়। আগেকার দিনের কথোপকথনের একটা উদাহরণ নীচে দেওয়া হোল।

[**পিতা-পুত্রে কথোপকথন :**

পিতা : খোকা? (বড় ছেলেকে খোকা বলে ডাকার রেওয়াজ ছিল)।

পুত্র : আঁজ্ঞে।

পিতা : শোন, আগামীকাল তুমি একবার কোর্টে যাবে। উকীলবাবুর কাছ থেকে মামলার তারিখটা জেনে আসবে।

পুত্র : কেন, আপনি জানেন না? আগামী মাসের দশ তারিখে মামলা উঠবে। মুহুরীবাবু একথা জানিয়ে গেছেন।

পিতা : বেশ, ভাল কথা। তাহ'লে তো মামলার তদ্বির করতে হ'বে, সাক্ষীদের খবরা-খবর দিতে হ'বে। সময় তো খুব বেশী নেই।

পুত্র : সে জন্য আপনি ভাববেন না। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করছি।]

আজকাল অবশ্য কথার ধরণ অনেক পাল্টে গেছে। উপরোক্ত কথোপকথনের এখনকার একটা উদাহরণ নীচে দেওয়া হোল।

পিতা : সোমু? (সোমনাথকে 'সোমু' বলে ডাকা হয়েছে)

পুত্র : আমায় ডাকছ বাবা?

পিতা : শোন্, আজকে একবার কোর্টে গিয়ে উকীল বাবুর কাছ থেকে জেনে আসবি আমদের মামলাটা কবে উঠছে।

পুত্র : কেন, তুমি জান না? মোক্তারদা বলে গেছে আগামী মাসের দশ তারিখে আমাদের মামলার দিন পড়েছে।

পিতা : তাই নাকি? তাহলে তো আর সময় নেই। সাক্ষীদের সব জানিয়ে দিয়েছিস? সবাই একসঙ্গে কোর্টে যাব।

পুত্র : সেজন্য তুমি ভেব না। সে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।]

পিতাপুত্র, শিক্ষক-ছাত্র, মা-ছেলে প্রভৃতি সকলের মধ্যেই নানারকম কথাবার্তা হয়। তারও কিছু কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

বাবা-ছেলে

বাবা : হ্যাঁরে শঙ্কর, তুই ইংরেজীতে এত কম নম্বর পেলি কেন?

ছেলে : আমি কি করে বলব? আমি তো সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলাম।

বাবা : সব প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিলে কেউ এত কম নম্বর পায়। তুই কি মনে করেছিস যে আমরা কখনও লেখাপড়া করিনি, না পরীক্ষা দিইনি।

ছেলে : আমি তো সেকথা বলি নি।

বাবা : তবে তুই কি বলতে চাস?

ছেলে : ইংরেজী-স্যারের আমার ওপর রাগ আছে তাই হয়তো কম নম্বর দিয়েছেন।

বাবা : কী বললি? ছিঃ, ছিঃ। নিজের অযোগ্যতা ঢাকবার জন্য মাষ্টার-মশায়ের ওপর দোষ দিচ্ছিস। শোন, আমরাও দুষ্টু ছিলাম, অন্যায় করতাম। মাষ্টার মশাইরা রাগও করতেন। কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিলে নম্বর দিতেও কার্পণ্য করতেন না।

ছেলে : তোমাদের যুগ আলাদা ছিল।

বাবা : ফের আর একটা বাজে কথা বললি। নিজের দুর্বলতা, অযোগ্যতা ঢাকবার জন্য এসব বাজে কৈফিয়ৎ কখনও দিবি না। পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়েছিস এই সত্যি কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। এখন থেকে মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। আর কখনও যেন তোমার মুখে এসব কথা না শুনি। যাও।

উপরোক্ত কথোপকথনে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার মত। একে বারে শেষের দিকে বাবা ছেলেকে তুই এর বদলে 'তুমি' সম্বোধন করছেন। কেন? কারণ এখানে বাবা

ছেলেকে আদেশ করছেন। আদেশের গাম্ভীর্য্য রক্ষার পক্ষে 'তুই' কথাটা খুবই হাল্কা ; তাই 'তুমি' কথাটা ব্যবহার করেছেন।

এখানে আর একটা জিনিষ উল্লেখ করা দরকার। আদিবাসী, উপজাতি এবং তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে ছেলে, মেয়ে, বাবা, মা পরস্পরকে 'তুই' বলে সম্বোধন করছে। এই 'তুই' সম্বোধনটা দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। কিন্তু তার জন্য পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহের কোন অভাব নেই।

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্কটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির। ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে, শিক্ষকমহাশয়ও ছাত্রকে ভালবাসবেন, স্নেহ-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে অবশ্য এই সম্পর্কে একটু চিড় ধরেছে—কিন্তু সেটা আদর্শ অবস্থা নয়। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য দায়ী। অবশ্য সে আলোচনা এখানে করছি না এবং সে আলোচনার ক্ষেত্রও এটা নয়। আদর্শ অবস্থায় **শিক্ষক-ছাত্র কথোপকথনের** একটা উদাহরণ নীচে দেওয়া হোল :

ছাত্র : স্যার, আপনাকে একটু বিরক্ত করব ?
(যদিও 'স্যার' কথাটা ইংরেজি শব্দ—তবুও মাষ্টারমশাই না বলে 'স্যার' বলার রেওয়াজ আজও চলছে।)

শিক্ষক : কি বললি ? বিরক্ত করবি ? আরে তোরা যত বিরক্ত করবি ততইতো আমাদের আনন্দ। বল কি বলবি।

ছাত্র : বলছিলাম, গতকাল ইতিহাস পড়াতে পড়াতে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণের কথা বলছিলেন সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। যদি আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেন তাহলে খুব ভাল হয়।

শিক্ষক : খুব ভাল কথা। এর জন্য এত কিন্তু কিন্তু করছিলি কেন ? আমি তোদের বলে দিয়েছি না যে যখনই কোন কিছু বুঝতে পারবি না—সোজাসুজি আমাকে বলবি। আরে তোদের বোঝানই তো আমার কাজ। যতক্ষণ না বুঝবি—ততক্ষণ বোঝাব।

ছাত্র : না-স্যার, সে কথা নয়। তবে কিনা—আপনার এত কাজের চাপের মধ্যে আবার বিরক্ত করব—তাই।

শিক্ষক : ঢের হয়েছে, আর পাকামি করতে হবে না। কিন্তু বাবা, তুই যেটা বুঝতে চাইছিস সেটাতো খুব অল্প সময়ে হবে না। অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় চাই। আচ্ছা এক কাজ কর ; আগামী শনিবার স্কুল-ছুটির পর তোরা থাকবি।

ছাত্র : কিন্তু স্যার, শনিবার দিন যে আবার স্কুলের খেলা আছে।

শিক্ষক : হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছিস্। তবে কি করা যায় বলত ?

ছাত্র : আমি বলছিলাম আগামী বুধবার তো নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি আছে। আর সেদিন আমরা স্কুলেও আসছি। যদি আপনার অসুবিধে না হয় তাহলে সেদিন হতে পারে।

শিক্ষক : খুব ভাল কথা বলেছিস। সকালে স্কুলের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর বসা যাবে। ক্লাসের সবাইকে খবর দিয়ে দিস।

ছাত্র : ঠিক আছে, খবর দিয়ে দেব। এখন চলি স্যার।

বন্ধুতে বন্ধুতে নানা কথোপকথন হয়। একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়। মজা এই যে কথা আরম্ভ হোল হয়তো খেলাধুলা নিয়ে শেষ হ'ল হয়তো আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে।

এই রকম একটা উদাহরণ নীচে দেওয়া হোল :—

কয়েকজন বন্ধু কথা বলছে।

১ম বন্ধু : কালকে সুভাষ যা খেললে না···কি বলব ?

(লক্ষ্য করবার বিষয় যদিও সুভাষ নামক খেলোয়াড়টি বক্তার চেয়ে বয়সে বড়, তবুও তার নাম ধরেই বলছে। এরকম নাম ধরে বলার রেওয়াজ আছে।)

২য় বন্ধু : দূর দূর, হাবিব ছিল তাই রক্ষে। না হ'লে সুভাষের খেলা অত উঠত নাকি ?

৩য় বন্ধু : সকালবেলা তোরা আবার ফুটবল নিয়ে শুরু করলি। এক্ষুনি তো হাতাহাতি করবি! চালের দর চার টাকা কিলো, লোক খেতে পাচ্ছে না সেদিকে খেয়াল নেই বাবুরা ফুটবল খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে।

২য় বন্ধু : দেখ, বাজে বকিস্ নি। অভাব চিরকাল ছিল, থাকবে, তাব'লে ফুটবল খেলা বন্ধ হয়ে যাবে ? আরে একটু মজা, একটু আনন্দতো চাই-ই। অভাব বলে সারাদিন মুখ গোমড়া ক'রে বসে থাকব নাকি।

৩য় বন্ধু : সে কথা আমি বলেছি নাকি। একটু সীরিয়াস কিছু আলোচনা কর। তোদের সব সময়ই হয় সিনেমা, নয় ফুটবল, নয় ক্রিকেট।

১ম বন্ধু : না বাবা, ও সব সীরিয়াস ব্যাপারে আমি নেই। স্কুলে পড়ছি, বাবার হোটেলে আছি, আদার ব্যাপারী আমাদের ওসব জাহাজের খবরে কি দরকার ? ওসব কথা বড়রা ভাববে।

২য় বন্ধু : ঠিক বলেছিস। যাকগে যে কথা হ'চ্ছিল—তোর ঐ সুভাষের হিসাবটা ঠিক না। আমি বলছি না যে সুভাষ খারাপ খেলে—কিন্তু পাশে হাবিব না থাকলে কি হ'ত বল।

১ম বন্ধু : আরে বাবা একা একা কি খেলা হয়? আর খেলা তো দূরের কথা, কোন বড় কাজই কি একা একা করা যায়? তবে তুই যাই বল আমার মতে কালকের মাঠে সুভাষই সবচেয়ে ভাল খেলেছে।

৩য় বন্ধু : চেপে যা বাপ্। ওই সুভাষ আর হাবিব নিয়ে এক্ষুনি তো লড়ে যাবি। তার চেয়ে চল আজ ম্যাটিনী শোতে সত্যজিত রায়ের 'অশনি-সংকেত' দেখে আসি।

২য় বন্ধু ; ওরে বাবা—পয়সা পাব কোথায়? সিনেমার পয়সা চাইতে গেলেই মা রেগে যাবে।

১ম বন্ধু : দূর বোকা। আমরা তো আর বাজে সিনেমা দেখব না। মাকে বলবি যে সত্যজিত রায়ের 'অশনি-সংকেত' দেখবি? দেখবি মা রাজী হয়ে যাবে।

৩য় বন্ধু : চল, তোর হয়ে আমরাও মাসীমার কাছে যাচ্ছি। আরে ভয় পাচ্ছিস কেন? বাজে বই হ'লে মাসীমা রাগ করতেন। এটা তো আর বাজে বই নয়, দেখবি মাসীমা ঠিক রাজী হয়ে যাবেন।

১ম বন্ধু : ওঠ্ ওঠ্ অনেক বেলা হয়ে গেল। আবার স্নান করে, খেয়ে দেয়ে বেরোতে হবে।

সম্প্রতি কলকাতা, ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় বাসভাড়া প্রতি স্টেজে পাঁচ পয়সা করে বেড়েছে। তাই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদের অন্ত নেই; বাসও নিয়মিত চলাচল করছে না। যাত্রী সাধারণের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। এই সম্পর্কে একটা বাসের মধ্যে বিভিন্ন যাত্রী যে সমস্ত মন্তব্য করছেন তারই একটা ছবি নীচে তুলে দেওয়া হোল :

১ম যাত্রী : এই যে দাদা, শুনছেন, ভাড়াটা নিন।

২য় যাত্রী : দাদা, বাড়তি ভাড়া এক পয়সাও দেবেন না।

১ম যাত্রী : কেন দাদা? যাব অথচ ভাড়া দেব না সে কি রকম কথা। বাড়তি ভাড়া না দিলে তো কন্ডাক্টর দাদা ভাড়া নেবেন না।

২য় যাত্রী : ভাড়া না নেয়, না নেবে—আপনি যেখানে যাবার যাবেন। আগের ভাড়া দেবেন; নিতে হয় নেবে না নিতে হয় নেবে না।

৩য় যাত্রী : ঠিক বলেছেন, কেন বাড়তি ভাড়া দেব? ওদের কি লাভ হচ্ছে না? আর বাসতো চলে ডিজেলে, ডিজেলের দামতো বাড়েনি। দাম বেড়েছে পেট্রোলের। বাড়তি ভাড়া দেব না।

৪র্থ যাত্রী : দেখুন, আপনারা অযথা ঝগড়া-ঝাঁটি করছেন। পেট্রোলের দাম বেড়েছে বলে তো বাসের ভাড়া বাড়েনি। সরকার কমিশন বসিয়েছিল পেট্রোলের দাম বাড়বার আগে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভাড়া বেড়েছে।

১ম যাত্রী : ঠিক বলেছেন দাদা। বাস-মালিকরা তো বাস ভাড়া বাড়ায়নি। বাড়িয়েছে সরকার কমিশনের সুপারিশের ওপর।

কনডাক্টর : দেখুন আমরা কি করব ? আপনারা ভাড়া না দিলে কি করে চলবে ? তাতে আমার আপনার সকলেরই অসুবিধে।

৩য় যাত্রী : ভাড়া দেব না এ কথা তো বলিনি। বাড়তি ভাড়া দেব না। আগের ভাড়া দিতে তো আমরা সব সময়েই রাজী।

কনডাক্টর : কিন্তু আগের ভাড়া তো আমরা নিতে পারছি না। নতুন ভাড়ার ওপরই টিকিট দিতে পারব।

৫ম যাত্রী : ওর সঙ্গে তর্ক করে কি হবে। বাসভাড়া পাঁচপয়সা বেড়েছে তাতেই আমরা লাফাচ্ছি। কিন্তু এই যে চাল, ডাল, তেল, চিনি, আলু, কুমড়া, পেঁয়াজ সব জিনিষের দাম টাকা প্রতি ৩০।৪০ পয়সা করে বেড়ে গেল সেদিকে তো আমাদের নজর নেই। সে বেলা তো ঠিক বাজারে যাচ্ছি, জিনিষও কিনছি ; যত সব !

২য় যাত্রী : দাদা, উলদেশ দেবেন না। ওসব কথা ছাড়ুন। আপনার কি ? আমার বাড়ীতে পাঁচজন বাসে যাতায়াত করি। মাথা পিছু যাতায়াতে কম করে দশপয়সা বেশী লাগলেও মাসে পনের টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে। টাকাটা আসবে কোত্থেকে শুনি। দরকার হলে দিনে দু-চারবারও যাতায়াত করতে হয়।

১ম যাত্রী : কিন্তু জিনিষপত্রের দাম বাড়ার জন্য কত পয়সা বাড়তি খরচ হচ্ছে, তার হিসাবটা দিন। মাসে কত টাকা বেশী লাগছে বলুন।

৩য় যাত্রী : কিন্তু তার উপরে তো এটা যোগ হচ্ছে। একেতো খেতেই পয়সা জুটছে না। তার ওপর এইসব বাড়তি খরচা এলে চলবে কি করে ? তারপরে বুঝতুম বাস মালিকদের লোকসান হচ্ছে, ত'হলে না হয় অন্য কথা।

২য় যাত্রী : তা ছাড়া আমরা যখন বাসে করে অফিস-কাছারীতে যাই তখনকার অবস্থাটা ভাবুন। বাদুড় ঝোলা হয়ে প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। পিজরা-পোলের জন্তরাও এত চেয়ে ভাল অবস্থায় যায়।

৪র্থ যাত্রী : এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত। বাসের ভাড়া বাড়ালে যাতায়াতের সুবিধে দিতে হ'বে। যাতে সুস্থ ভাবে, ভদ্র ভাবে যেতে পারি।

৫ম যাত্রী : আমারও দাদা তাই মত। তবে কি জানেন, অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসের টায়ার, যন্ত্রপাতি, গাড়ী প্রভৃতির দামও প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে। সে কথাটাও একবার আমাদের ভাবা উচিত।

ইত্যাদি ইত্যাদি……

কথোপকথন সম্পর্কে বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। শুধুমাত্র উদাহরণ দিয়ে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। অভ্যাস করতে হয়, অনুশীলন করতে হয়। আমরা সর্বদাই কথা বলি, কথা শুনি। এর থেকেই কথাবার্তা কি রকম বলতে হয় সেটা শিখতে হবে। শুধু একটা কথা সব সময়ই খেয়াল রাখতে হবে, যখনই যার সঙ্গে কথা বলি, কি নিজের কি অপরের, আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদা যেন ক্ষুণ্ন না হয়।

অনুশীলনী :

(১) ফুটবলে ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি 'কথোপকথন' রচনা কর।

(২) পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বাড়ী ফিরেছ। বাড়ী ফিরে বাবা-মার সঙ্গে কথোপকথনের একটি চিত্র অঙ্কন কর।

(৩) স্কুলের কাজ করে নিয়ে যাওনি। মাষ্টারমশাই খুব রেগে গিয়েছেন। এই সময়কার কথাবার্তার একটা ছবি দাও।

(৪) দুই বন্ধুতে খুব তর্ক হচ্ছে চন্দ্রশেখর বড় বোলার না বেদী বড় বোলার এই নিয়ে। এই সময়কার কথাবার্তার একটা ছবি দাও।

(৫) কয়েকজন বন্ধু পরীক্ষার পর বেড়াতে যাবে ঠিক করছ। কোথায় বেড়াতে যাবে, কদিন থাকবে—সেখানে কি রকম মজা হবে এই সম্পর্কে বন্ধুদের মধ্যে কথোপকথনের একটা ছবি দাও।

সাত

॥ প্রশ্নোত্তরদান ॥

ভূমিকা—প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ প্রশ্ন এবং উত্তর। প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিতে হয়। পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীরা খাতায় সেই সব প্রশ্নের উত্তর লেখেন। মাষ্টার মশাই ক্লাশে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ছাত্ররা সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রতিযোগিতা চাকুরীর ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা চাকুরী প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেন। সেখানে প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যথাযথ উত্তর দিতে হয় যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য। এটাকে মৌখিক পরীক্ষা বলে। তাছাড়া আমরা প্রতিনিয়ত জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হই। অনেক সময় সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, অনেক সময় উত্তর খুঁজে বেড়াই। শিশু তার অদম্য কৌতুহল মেটাবার জন্য পিতা মাতা বা অন্যান্য অভিভাবককে অসংখ্য প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে। সাধারণ মানুষ বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করেন। বিজ্ঞানী সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেন। সাহিত্যিক বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করেন। ডাক্তারবাবুদের তো কথাই নেই। তাঁরা হাজারো রোগীর হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন অহোরহ। দেশের প্রশাসক, মন্ত্রীদের প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত করছেন সাংবাদিকরা। উকীল সাক্ষীকে যখন জেরা করেন তখন তিনি সাক্ষীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নাজেহাল করেন। বিচারক প্রশ্ন করেন উকীলকে, বাদীকে, বিবাদীকে। অতএব দেখা যাচ্ছে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই নেই, উত্তরও তার দিতে হবে বা খুঁজতে হবে।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল 'গাছ থেকে আপেল কেন মাটিতে পড়ে?' প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন—আবিষ্কার হ'ল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও তার সূত্র। রাজার মনে প্রশ্ন জেগেছিল 'কেমন করে সোনার মুকুট না ভেঙ্গে বার করা যায় সোনায় কোন খাদ আছে কিনা?' আবিষ্কৃত হল আর্কিমিডিসের সূত্র। নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর বার করার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানের নব নব পদক্ষেপ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সভ্যতার অগ্রগতি।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে অর্জ্জুন অস্ত্রধারণ করতে অসম্মত হলেন। তাঁর প্রশ্ন কি হবে

যুদ্ধ করে—যে যুদ্ধে মারা যাবে নিজেদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আপনজনেরা। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সৃষ্টি হোল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ভারতীয় দর্শন, পুরাণের জটিল তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি এইরূপ এক একটি জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ মানুষের জীবনে জরা, মৃত্যু কেন আসে, মোক্ষলাভের উপায় কি, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গৃহত্যাগী হলেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধ হলেন, সৃষ্টি হোল বৌদ্ধধর্ম। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা হচ্ছে অজনাকে জানার অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রসূত বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা বক্তব্য খুব সুস্পষ্টভাবেই বেরিয়ে আসছে যে প্রশ্নোত্তর বিষয়টা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে হবে। এটা হেলাফেলার জিনিষ নয়।

লিখিত পরীক্ষা :—

প্রথমেই আমরা আলোচনা করব লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর নিয়ে। প্রশ্ন ছোট, বড় বিভিন্ন রকমের হয়। আবার প্রশ্ন সরল হ'তে পারে, জটিলও হতে পারে। ছোট প্রশ্ন বলতে আমরা বুঝি যে প্রশ্নের উত্তর ছোট হবে। সেইরকম বড় প্রশ্নের উত্তর বড় হবে। সরল প্রশ্নের অর্থ যে প্রশ্নের উত্তর সহজ সরল—যে উত্তর কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দ্বিমত বা তর্কের অপেক্ষা রাখে না। জটিল প্রশ্ন বলতে সাধারণতঃ সেইসব প্রশ্ন বোঝায় যার উত্তর তর্কাতীত নয় বা যে প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার থাকে অথবা যে সব প্রশ্নের উত্তরে 'নানা মুনির নানা মত' প্রচলিত আছে ইত্যাদি। একটু উদাহরণ সহ আলোচনা করলে সম্ভবতঃ জিনিষটা পরিষ্কার হবে।

প্রশ্ন : ১ :—মাধ্যাকর্ষনশক্তির আবিষ্কর্তা কে ?

প্রশ্ন : ২ :—ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

উপরের প্রশ্ন দুটিকে আমরা ছোট এবং সরল বলতে পারি। কারন প্রশ্ন দুটির উত্তর খুবই ছোট এবং উত্তরে কোন সন্দেহ বা তর্কের অবকাশ নেই। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর নিউটন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর বাবর।

প্রশ্ন : ৩ : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কে ?

প্রশ্ন : ৪ : রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি ?

উপরোক্ত প্রশ্ন দুটির উত্তর খুবই ছোট। কিন্তু উত্তর সহজ নয় এবং একজনের

উত্তরের সঙ্গে অপর একজনের মতের মিল নাও হতে পারে। অতএব প্রশ্ন দুটি ছোট হলেও জটিল।

প্রশ্ন ৫ : নিউটনের গতির সূত্রগুলি উদ্ধৃত কর এবং উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

প্রশ্ন ৬ : বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সম্রাট অশোকের অবদান বিবৃত কর।

উপরের প্রশ্ন দুটির উত্তর বড় কিন্তু জটিলতা নেই। উত্তর সম্বন্ধে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই। এ জাতীয় প্রশ্নকে আমরা বড় এবং সরল প্রশ্ন বলতে পারি।

প্রশ্ন ৭ : 'আপেল মাটিতে পড়ে কিন্তু গ্যাসবেলুন আকাশে উড়ে। পাখী আকাশে উড়ে কিন্তু মানুষ উড়িতে পারে না কেন?' বিজ্ঞানের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়া উপরোক্ত ঘটনাগুলি বুঝাইয়া দাও।

প্রশ্ন ৮ : 'অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারক অপেক্ষা রাজ্যশাসক হিসাবে অনেক বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।'—এই উক্তির যথার্থতা বিচার কর।

উল্লিখিত প্রশ্ন দুইটির উত্তর শুধু বড় হ'বে না, উত্তরের মধ্যে কিছু জটিলতা আছে। ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে বিজ্ঞানের সূত্রগুলি সঠিকভাবে বুঝতে হ'বে এবং তার প্রয়োগ দ্বারা ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। ৮নং প্রশ্ন খুবই বিতর্কমূলক। উত্তরদাতা এই উক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু যে উত্তরই দিন না কেন, যুক্তি সহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করে দিতে হ'বে।

আর একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। প্রশ্ন খুব সোজা হয়েছে বা খুব কঠিন হয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর জানার মধ্যে হলে প্রশ্ন সহজ। না হলেই কঠিন। ব্যাপারটা তাই নয় কি? বিষয়বস্তু যদি আমার জানা থাকে—তাহ'লে সেই বিষয়বস্তু থেকে যে প্রশ্নই হোক না কেন তার উত্তর দিতে আমার অসুবিধা হয় না। অতএব সহজ প্রশ্ন বা কঠিন প্রশ্ন কথাটা ঠিক নয়। প্রশ্ন সরল (simple and straight) বা জটিল (critical) হতে পারে। প্রশ্ন ছোট (short) বা বড় বা দীর্ঘ (long) হ'তে পারে। পাঠ্যবস্তুর বাইরে কোন প্রশ্ন অবশ্যই হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। একটা প্রশ্নের জন্য হয়ত ২০ নম্বর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীদের ধারণা যেহেতু ২০ নম্বর আছে অতএব উত্তর খুব বড় লিখতে হ'বে। এটা খুব ভুল ধারণা। উত্তর সব সময়ই প্রশ্ন অনুযায়ী যতটুকু হওয়া উচিত ততটুকুই হবে। যেমন সাহিত্যের প্রশ্নে রচনা লেখার জন্য হয়তো ২০ নম্বর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীরা বড় করে রচনা লিখতে গিয়ে হয়তো

পরীক্ষার খাতার ৬ পাতা লিখলেন। তিনঘণ্টা সময়ের দেড় ঘণ্টা রচনা লিখতে খরচ হয়ে গেল। বাকী দেড় ঘণ্টায় ৭৫ নম্বরের উত্তর দিতে হবে। ফল হয় বাকী প্রশ্ন ভাল করে লেখা হয় না। হয়তো বা দু-একটা প্রশ্ন প্রায়ই ছেড়ে দিতে হয়। বিশেষ করে সাহিত্যে ও ইতিহাসের পরীক্ষায় হামেশাই এ ঘটনা ঘটে। সাহিত্যের প্রশ্নের উত্তরে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ভাষার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য, অবশ্য উত্তরটা সঠিক হওয়া চাই। ইতিহাসে ভাষায় শুদ্ধতা চাই, তবে সেখানে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ঠিকভাবেই দিতে হবে। উত্তর বড় হ'লেই পরীক্ষায় নম্বর বেশী পাওয়া যাবে এ ধারণা ভুল। উত্তর সঠিক ও সুন্দর হ'লেই বেশী নম্বর পাওয়া যায়। প্রশ্নের উত্তর লেখা অভ্যাস করতে হবে এবং মাষ্টারমশাইকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে হবে। মাষ্টারমশাই বলে দিতে পারবেন সঠিক উত্তর কি হবে? শুধু পড়লেই হবে না—লেখা অভ্যাস করতে হবে।

পরীক্ষার হলে বসে পরীক্ষার্থীরদের অবশ্য করণীয় কাজ :

(১) প্রথমে প্রশ্নগুলি ভাল করে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি করে প্রশ্ন পড়ার ফলে অনেক ভুল হয় এবং পরীক্ষার পরে যখন ভুল ধরা পড়ে তখন আফশোষের অন্ত থাকে না।

(২) প্রশ্নগুলি ভাল করে বাছাই করতে হবে। যে প্রশ্নগুলি খুব ভাল করে জানা সেগুলির উত্তর আগে দিতে হবে। যে প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য চিন্তা করতে হবে সেগুলি পরে লেখা উচিত।

(৩) প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময় ভাগ করে নিতে হ'বে। একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশী সময় ব্যয় করলে অন্য প্রশ্নের উত্তর ভাল করে দেওয়া যাবে না—হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না।

(৪) যদি পরীক্ষার জন্য তিনঘণ্টা সময় থাকে, তবে পৌনে তিনঘণ্টার মধ্যে উত্তর লেখা শেষ করতে হবে। বাকী পনের মিনিট ধরে লেখা উত্তরগুলি আর একবার ভাল করে দেখা এবং কোন ভুল থাকলে সংশোধন করে দেওয়া।

পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে একটা ব্যাপার প্রায়ই নজরে পড়ে। প্রশ্নে যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে উত্তরে প্রশ্নবহির্ভূত কিছু বাড়তি অংশ আছে। এরূপ হওয়ার কারণ প্রশ্নটি সঠিক ভাবে বুঝতে না পারা। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরের একটা সীমারেখা আছে—সেটা লঙ্ঘন করতে নাই।

প্রশ্ন : "ওই মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই?"—কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন? উক্তিটির অর্থ কি? ('ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) :

এই প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে দ্বিতীয় অংশে ছাত্ররা প্রায়ই 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার লিখে আসেন। কিন্তু উত্তর তা হবে না। উত্তরে বলতে হবে লেখকের নাম এবং কোথায় কি প্রসঙ্গে তিনি এই উক্তি করেছেন। অতঃপর উক্তিটির ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ লেখক মাটির প্রদীপের সঙ্গে কিসের তুলনা বুঝিয়েছেন। তাহলেই উত্তর সঠিক হবে।

প্রশ্ন : সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায়ই দেখা যাবে কারণ এবং ফলাফলের সঙ্গে বিদ্রোহের সমস্ত ঘটনাবলীও লেখা হয়েছে। সঠিক উত্তরে শুধুমাত্র কারণ ও ফলাফল থাকবে। ঘটনাবলী থাকবে না। কিন্তু ছাত্ররা ঘটনাবলী লিখতে গিয়ে উত্তরের কলেবর বৃদ্ধি করে এবং পরীক্ষার সময় নষ্ট করে অথচ নম্বরও কম পায়।

একথা মনে রাখতে হবে প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে উত্তরে সেটা লেখার সাথে কিছু বেশী লিখলে নম্বর কমে যায়, বাড়ে না। বেশী লেখার অর্থ প্রশ্নটি সঠিক ভাবে না বুঝা।

আর একটা জিনিষ সাহিত্যের প্রশ্নের ব্যাপারে প্রায়ই নজরে আসে। সারাংশ (Substance) এবং সারমর্মের (central idea) মধ্যে যে পার্থক্য আছে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন নয়। কবিতার সারমর্ম লিখতে দিলেও তারা সারাংশ লিখে আসে। সারাংশ বলতে বোঝায় কবিতার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার। কিন্তু সারমর্ম বলতে বোঝায় কবিতার মূলবক্তব্য বা মর্মার্থ।

সর্বোপরি একটা কথাই বলতে হয় যে প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিতে হলে পাঠ্যবস্তু বা বিষয়বস্তু ভালভাবে অধ্যায়ন করে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং উত্তর লেখার ব্যাপারে যথেষ্ট অনুশীলন করতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষা : (viva-voci) এবার আলোচনা করা যাক মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে সবসময় মেধা ও জ্ঞান সঠিকভাবে যাচাই হয় না। কারণ খুবই স্পষ্ট। পরীক্ষার্থীরা অধিকাংশই মোটামুটিভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিজেদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন এবং তাঁদের পড়াশুনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত অংশের বাছাইয়ের উপর (Selective study)। যে সকল পরীক্ষার্থী প্রশ্নগুলি তাঁদের বাছাই করা অংশের মধ্যে পান তাঁরা উত্তরও ভাল লেখেন এবং পরীক্ষার ফলও ভাল করেন। কিন্তু যাঁরা ঐভাবে নির্বাচিত অংশের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করেন না তাঁরা যথেষ্ট পড়াশুনা করলেও পরীক্ষায় সব সময় ভাল ফল করতে পারেন না। অবশ্য একথা ঠিক যে যাঁরা পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেন তাঁরা সকলেই ভাল

ছাত্র। অপরদিকে মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রদের মেধা ও জ্ঞানের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বি. এ., এম. এ. পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষার সাথে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এমন কি, ডি. ফিল, পি. এইচ. ডি, ডি. এস. সি, ডি. লিট, এম. ডি. প্রভৃতি ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য যাঁরা থীসিস জমা দেন তাঁদেরও পরীক্ষকদের সামনে উপস্থিত হতে হয়, এবং পরীক্ষকেরা তাঁদের প্রশ্ন করেন। পরীক্ষকগণ তাঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট হলে তবেই তাঁরা ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন নেই বললেই চলে। স্কুলে নিম্নপ্রাথমিক (২য় শ্রেণী) পর্য্যন্ত মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন আছে। এখানে যেহেতু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লিখতে পারে না তাই মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা। অবশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যথা, I. A. S. W. B. C. S. প্রভৃতি পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষার সাথে মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন আছে।

সত্যি কথা বলতে কি লিখিত পরীক্ষার সাথে মৌখিক পরীক্ষা থাকা প্রয়োজন। মৌখিক পরীক্ষায় যথাযথ প্রশ্ন করে বোঝা যায় যে পরীক্ষার্থীর অধীত বিষয়ের উপর কতখানি জ্ঞান জন্মেছে, কতখানি দখল জন্মেছে। লিখিত পরীক্ষা প্রশ্ননির্ভর হতেই হবে। ফলে বহু ছাত্র important প্রশ্নের উত্তরগুলি মুখস্থ করে এবং খাতায় তা লিখে আসে। ফলে পরীক্ষায় সে নম্বরও ভাল পায়। কিন্তু এর দ্বারা বোঝা যায় না যে বিষয়টা তার আয়ত্ত হয়েছে কিনা। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় এটা যাচাই হয়। কারণ বিষয়টা আয়ত্ত থাকলে পরীক্ষার্থী যে কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবে। না পারলে বোঝা যাবে যে বিষয়টা তার আয়ত্তাধীন নয়। আর একটা কথা। আমাদের দেশে পরীক্ষায় এখন ব্যাপকহারে টোকাটুকি চলছে। এটা বন্ধ করার একমাত্র উপায় লিখিত পরীক্ষার সাথে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

ধরা যাক একজন পরীক্ষার্থী ইতিহাসের লিখিত পরীক্ষায় খুব ভাল লিখেছে। কিন্তু তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হল যে পলাশীর যুদ্ধ কোন সালে হয়েছে ? বা ভারতবর্ষের শেষ মোগল সম্রাট কে ? বা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কত সালে কার সাথে কার হয়েছিল ? বা কুষাণ যুগের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ? ইত্যাদি, তিনি সবগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। তাহলে কি তাঁকে ইতিহাসের ভাল ছাত্র বলে চিহ্নিত করতে হবে ? নিশ্চয়ই না। এজন্যই মৌখিক পরীক্ষার একান্ত দরকার।

ইন্টারভিউ :—ইন্টারভিউতে মৌখিক পরীক্ষা হয়। সেখানে অবশ্য কিছু কিছু

প্রশ্নের ধরন একটু আলাদা হয়। কারণ ইন্‌টারভিউতে প্রার্থীর জ্ঞান, যোগ্যতা প্রভৃতি যাচাই করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরীক্ষাও (Personality test) নেওয়া হয়। সেখানে কিছু কিছু অদ্ভুত প্রশ্ন করা হয় প্রার্থীর উপস্থিত বুদ্ধি, তাঁর মেজাজ প্রভৃতি পরীক্ষা করার জন্য।

ধরা যাক একটা ঘরে পাঁচজন পরীক্ষক বসে আছেন। প্রার্থীকে ডাকা হোল। প্রার্থী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচজন পরীক্ষক একসঙ্গে তাঁর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়লেন। তাঁরা প্রার্থীকে বসতেও বললেন না। সাধারণভাবে যে কোন ব্যক্তিরই এই অবস্থায় থতমত খাওয়ার কথা। কিন্তু থতমত খেলে চলবে না কারণ একথা ঠিকই যে একই সঙ্গে পাঁচজনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। অতএব প্রার্থীকে ঘাবড়ালে চলবে না। পরীক্ষকদের অনুমতি নিয়ে প্রার্থী প্রথমে বসবেন। তারপরে এক একজন পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। অনেক সময় চালাকি করে প্রশ্ন করা হয় যেমন :

(১) আকাশে কতগুলি তারা আছে ?

(২) আপনার মাথায় কতগুলি চুল ? ইত্যাদি।

এ প্রশ্ন করা হয় উপস্থিত বুদ্ধি পরখ করার জন্য। উত্তর হিসাবে যে কোন একটা বড় সংখ্যা বলতে হয়। যথা মাথায় দুলাখ দশটি চুল আছে বা আকাশে দশলাখ দুশো একটি নক্ষত্র আছে। যদি এরপরেও প্রশ্ন করেন যে 'আপনি কি করে জানলেন, আপনি কি গুণেছেন ?' তার উত্তরে বলতে হ'বে আমি তো স্যার উত্তর দিয়েছি ; এবার আপনারা গুণে দেখুন। ব্যাপারটা কিছুই না। পরীক্ষকেরাও জানেন যে প্রশ্নগুলো চালাকির প্রশ্ন এবং এর সঠিক কোন উত্তর নেই। তাঁরা এইরকম প্রশ্নের দ্বারা প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখেন।

আবার কখনও কখনও কোন সমস্যা প্রার্থীর সামনে তুলে ধরা হয় এবং প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি এইরকম সমস্যার সম্মুখীন হ'লে কি করতেন, কিভাবে সমাধান করতেন। সাধারণতঃ যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো সমস্যার আকারে সাজিয়ে উপস্থিত করা হয়। এস্থলে প্রার্থীকে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সমস্যার সমাধানের কথা বলতে হ'বে। অবশ্যই প্রচলিত সমাধানগুলির কথা মাথায় রেখেই উত্তর দিতে হ'বে।

তবে যখন কোন বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন হবে তখন সঠিক উত্তর দিতে হবে। তখন ভুল উত্তর দিলে চলবে না। ভুল উত্তর দেওয়ার চেয়ে জানি না বলা অনেক ভাল। কারণ সব জিনিষ সবাই জানবে এটা সম্ভব নয়।

ইন্টারভিউতে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সপ্রতিভভাবে চট্‌পট্‌ উত্তর দেওয়া, মেজাজ গরম না করা। প্রার্থীকে চেষ্টা করতে হবে যাতে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ না পায়।

পরিচ্ছদের শেষে সাধারণ জ্ঞানের জন্য কিছু প্রশ্নোত্তর দেওয়া হোল।

প্রশ্নোত্তর :

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের রাজ্য ও রাজধানীর নাম :

রাজ্য	রাজধানী
১। আসাম	শিলং
২। মণিপুর	ইম্ফল
৩। মেঘালয়	শিলং
৪। নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা
৫। পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা
৬। ত্রিপুরা	আগরতলা
৭। বিহার	পাটনা
৮। উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর
৯। অন্ধ্রপ্রদেশ	হায়দরাবাদ
১০। উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ
১১। হিমাচলপ্রদেশ	সিমলা
১২। পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়
১৩। হরিয়াণা	চণ্ডীগড়
১৪। জম্মুকাশ্মীর	শ্রীনগর
১৫। রাজস্থান	জয়পুর
১৬। মধ্যপ্রদেশ	ভূপাল
১৭। তামিলনাড়	মাদ্রাজ
১৮। কেরালা	ত্রিবান্দ্রাম
১৯। কর্ণাটক	বাঙ্গালোর
২০। মহারাষ্ট্র	বোম্বাই
২১। গুজরাট	আহমেদাবাদ

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল :

১।	অরুণাচল প্রদেশ	শিলং
২।	মিজোরাম	আইজল
৩।	পণ্ডিচেরী	পণ্ডিচেরী
৪।	দিল্লী	দিল্লী
৫।	চণ্ডীগড়	চণ্ডীগড়
৬।	গোয়া, দমন, দিউ	পানাজি
৭।	দাদরা-নগরহাভেলী	সিলভাসা
৮।	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্টব্লেয়ার
৯।	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভ্ দ্বীপ	কাভারত্তি

২। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত ?

উঃ ১৯৭১ সালের লোকসংখ্যা গণনার (আদমসুমারী) হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ।

৩। ভারতবর্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা কত ?

উঃ শতকরা ২৯ ৩৫ ভাগ লোক শিক্ষিত।

৪। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে শিক্ষিতের হার সর্ব্বাধিক ?

উঃ কেরালা। শতকরা ৬০·১৬ জন লোক শিক্ষিত।

৫। ভারতবর্ষের প্রথম তিনটি শহরের লোকসংখ্যা কত ?

উঃ কলিকাতা—৬০, ৪০, ৩৪৫

বৃহত্তর বোম্বাই—৫৯, ৩১, ৯৮৯

দিল্লী—৩৬, ২৯, ৮৪২

৬। ভারতীয় সংবিধানে যে ভাষাগুলি স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের নাম বল।

উঃ বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়া, আসামী, গুজরাটি, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরি, সিন্ধী।

৭। ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলি কোন কোন রাজ্যে ব্যবহৃত হয়।

উঃ	রাজ্য	ভাষার নাম।
	পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা
	বিহার	হিন্দী
	আসাম	আসামী ও বাংলা

রাজ্য	ভাষার নাম
উত্তর প্রদেশ	হিন্দী ও উর্দ্দু।
অন্ধ্রপ্রদেশ	তেলেগু
তামিল নাড়ু	তামিল্
কেরালা	মালয়ালম
কর্ণাটক	কানাড়া
মহারাষ্ট্র	মারাঠী
গুজরাট	গুজরাটী
রাজস্থান	রাজস্থানী ও হিন্দী।
পাঞ্জাব	পাঞ্জাবী
জম্মু কাশ্মীর	কাশ্মীরি ও ডোগরি
উড়িষ্যা	ওড়িয়া

৯। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (**Precemble to the Constitution of India**).

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রস্তাবনাটি পাঠ করিলে ভারতীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিক কাঠমোর আদর্শটি জানা যাইবে। প্রথমে ইংরাজীটি উদ্ধৃত করিয়া পরে বাংলা অনুবাদটি দেওয়া হইল।

We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to seccure to all its citizens :

Justice, social, economic and political ;

Liberty of thought, expression, faith, belief and worship ;

Equality of status and of opportunity and to promote among them all ;

Fraternity assuring the dignity of the individual and unity of the nation ;

In our constituent Assembly this twenty sixth day of November, 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution."

প্রস্তাবনার বাংলা অনুবাদ :

"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প বদ্ধ হইয়া সমগ্র ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং চিন্তার, বাক্যের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা, অবস্থা ও সুযোগের সাম্য এবং সকলের মধ্যে যাহাতে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হইয়া ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির সংহতি স্থাপিত হয় এই সংকল্পে বিশ্বাস হইয়া জনপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ, প্রণয়ন ও নিজেদের মধ্যে সমর্পণ করিতেছি।"

১০। প্রঃ ভারতের জাতীয় সংগীত কি কি ?

উঃ (১) জনগণমন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) বন্দেমাতরম্—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'জনগণমন' সংগীতটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-বিধাতা' কবিতার প্রথম স্তবক। সমগ্র কবিতাটি পাঁচটি স্তবকে বিভক্ত।

"বন্দেমাতরম্" সংগীতটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে 'বন্দেমাতরম্' আমাদের জাতীয় সংগীত ছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে সমস্ত রাজনৈতিক সভা ও সম্মেলনে 'বন্দেমাতরম্' উদ্বোধন সংগীত হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

১১। প্রঃ ভারতের জাতীয় পতাকা ও উহার ব্যবহার।

উঃ ভারতের জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণরঞ্জিত। উপরে কেশরী, মধ্যে সাদা ও নীচে ঘন সবুজ। প্রতিটি বর্ণের অংশ সমান। মধ্যের সাদা অংশের উপর গাঢ় নীল রঙের একটি চক্র আছে। এই চক্রটি সারনাথের অশোক স্তম্ভের ধর্মচক্রের অনুরূপ।

সমস্ত সরকারী ভবনে জাতীয় পতাকা উড়ান হয়। সর্বসাধরণ জাতীয় উৎসবের দিনে যেমন স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী জন্মদিবস, মহাত্মাগান্ধী জন্মদিবস প্রভৃতি দিনে জাতীয় পতাকা উড়াইতে পারে।

১২। প্রঃ ভারতের জাতীয় পশু কি ? উঃ বাঘ।

১৩। প্রঃ ভারতের জাতীয় পাখী কি ? উঃ ময়ূর।

১৪। প্রঃ ভারতের জাতীয় ফুল কি ? উঃ পদ্ম।

১৫। প্রঃ ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলির নাম কি ?

উঃ হিন্দুধর্ম, ইসলাম্, খ্রীষ্টধর্ম, শিখধর্ম, জৈনধর্ম।

১৬। প্রঃ ভারতে কি কি শ্রেষ্ঠ বা বৃহত্তম বা দীর্ঘতম ?

উঃ শ্রেষ্ঠ উপাধি বা পুরস্কার—ভারতরত্ন।

বীরত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—পরমবীর চক্র।

দীর্ঘতম রাজপথ—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড।

দীর্ঘতম সেতু—শোন নদীর উপর নেহেরু সেতু (১০,০৪৪ ফুট)।

দীর্ঘতম নদী—গঙ্গা।

উচ্চতম শৃঙ্গ—পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ হিমালয় পর্বতমালার এভারেষ্ট (২৯,১০৬ ফু) নেপালে অবস্থিত। ভারতবর্ষে অবস্থিত হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫ ফু)

বৃহত্তম হ্রদ—উলার (কাশ্মীর)

বৃহত্তম শহর—কলিকাতা

বৃহত্তম মন্দির—মীনাক্ষীমন্দির (মাদুরা)

বৃহত্তম প্রদেশ—উত্তর প্রদেশ

সর্বাধিক বৃষ্টিপাত—চেরাপুঞ্জী

বৃহত্তম গুহামন্দির—ইলোরা (হায়দরাবাদ)

দীর্ঘতম প্লাটফর্ম—সোনপুর

বৃহত্তম মসজিদ—জুম্মা মসজিদ (দিল্লী)

বৃহত্তম যাদুঘর—কলিকাতার যাদুঘর

বৃহত্তম চিড়িয়াখানা—আলিপুর চিড়িয়াখানা (কলিকাতা)

উচ্চতম স্মৃতিসৌধ—কুতুব মিনার, দিল্লী (২৯০ ফুট)

উচ্চতম মূর্তি—গোমতেশ্বরের মূর্তি (২৬ ফু), কর্ণাটক

প্রঃ ভারতের রাষ্ট্রপতিগণের নাম বল।

উঃ ১। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—১৯৫০-১৯৬২

২। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—১৯৬২-১৯৬৭

৩। ডঃ জাকির হোসেন—১৯৬৭-১৯৬৯

*৪। এম, হিদায়েতুল্লা (অস্থায়ী) ১৯৬৯

৫। ভি. ভি. গিরি—১৯৬৯—

* ডঃ জাকির হোসেন মারা যান ; নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে ভারতের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এম. হিদায়েতুল্লা অস্থায়ীভাবে কাজ করেন।

প্রঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রীগণের নাম বল।

উঃ ১। জওহরলাল নেহেরু—১৯৪৭-১৯৬৪

২। গুলজারিলাল নন্দ—১৯৬৪ (অস্থায়ী)

৩। লালবাহাদুর শাস্ত্রী—১৯৬৪-১৯৬৬

*৪। গুলজারিলাল নন্দ—১৯৬৬ (অস্থায়ী)

৫। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—১৯৬৬—

*প্রধানমন্ত্রীগণ হঠাৎ মারা যান। নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীনন্দ অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ চালান।

প্রঃ ভারতের কে কে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন ?

উঃ ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩-সাহিত্য)

২। সি. ভি. রমন (১৯৩০—পদার্থ বিজ্ঞান)

৩। হরগোবিন্দ খোরানা (১৯৬৮—শারীর বৃত্তে)

*শ্রীখোরানা ভারতীয় হইলেও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

জ্ঞান—বিজ্ঞান

১। (ক) মরুভূমি দিনে উষ্ণ, কিন্তু রাত্রে শীতল কেন ?

উঃ—মরুভূমির শুষ্ক বাতাসে মোটেই জলীয় বাষ্প থাকে না। শুষ্ক বাতাস উত্তাপ বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। যদিও উহা খুব দ্রুত উত্তপ্ত হয়। মরুভূমির মাটি ও বালি শুষ্ক। ফলে দিনের বেলায় খুব শীঘ্র মরুভূমির বাতাস, মাটি ও বালি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে—তাই দিনে মরুভূমি উষ্ণ।

কিন্তু রাত্রে তাপ দ্রুত বিকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে মরুভূমির বাতাস, বালি খুব শীঘ্র শীতল হয়ে পড়ে। এইজন্যে মরুভূমি রাত্রে শীতল।

(খ) দিনরাত্রি সমান হয় কোন্ কোন্ তারিখে ?

উঃ ২১শে মার্চ, ও ২৩শে সেপ্টেম্বর। এই দুই দিন পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা জায়গায় আসে যেখানে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য্য থেকে সমান দূরে থাকে। এবং সূর্য্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই দুই দিন পৃথিবীর অর্ধেক অংশ সূর্য্যের আলো পায় এবং অর্ধেক অংশ অন্ধকারে থাকে। ফলে এই দিন পৃথিবীতে দিনরাত্রি সমান হয়।

(গ) নরওয়েকে নিশীথ সূর্য্যের দেশ বলা হয় কেন ?

উঃ নরওয়ে উত্তর মেরুর নিকট অবস্থিত। ২১শে মার্চ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর

পর্য্যন্ত নরওয়েতে গ্রীষ্মকাল। এই সময় উত্তরমেরু অঞ্চল ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্যের নিকটবর্তী হয় এবং সূর্য্যালোক উত্তরমেরু অতিক্রম করে সাড়ে ২৩° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত পৌছায়। এইজন্য এই সময় উত্তরমেরু নিকটে অবস্থিত বলে এই সময় মধ্যরাত্রেও সূর্য্য দেখা যায়। এই কারণে নরওয়েকে নিশীথ সূর্য্যের দেশ বলা হয়।

(উপরোক্ত ভৌগলিক কারণেই উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু অঞ্চলে ছ মাস গ্রীষ্মকাল, ছ মাস শীতকাল।)

(ঘ) বহিঃশূন্যে মানুষ ভারহীন (ওজন হীন) বোধ করে কেন ?

উঃ মানুষ পৃথিবীতে ভার বোধ করে কারণ পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। বহিঃশূন্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই—তাই মানুষ ভারহীন বোধ করে।

(ঙ) চাঁদে বন্দুক ছুঁড়লে গুলির আওয়াজ শোনা যাবে কি ?

উঃ না, কারণ চাঁদে কোন বাতাস নেই যে শব্দতরঙ্গ বহন করে।

(চ) একটা দেশলাই কাঠি জালিয়ে একটা খালি গেলাস চাপা দিলে নিভে যাবে না জলবে ?

উঃ নিভে যাবে ; কারণ চাপা দেওয়ার পরে বাতাসে অক্সিজেনের অভাব ঘটবে এবং অক্সিজেনের অভাব ঘটলেই নিভে যাবে।

(ছ) পৃথিবী হইতে সূর্যের দুরত্ব কত ?

উঃ ৯,৩০,০০০০০ মাইল (ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল)।

(জ) পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দুরত্ব কত ?

উঃ ২,৩,৮৬৯ মাইল (দু' লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশত উনষাট মাইল)।

(ঝ) বিষুবরেখার উপর একটি বস্তুর ওজন মেরুঅঞ্চলে সেই বস্তুর ওজন অপেক্ষা কম হইবে।

উঃ বিষুবরেখা ভূকেন্দ্র থেকে দুরে বলে সেখানে মধ্যাকর্ষণ শক্তি কম, মেরুঅঞ্চল ভূকেন্দ্রের নিকটে বলে সেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশী ; মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যত বেশী হবে ওজনও তত বেশী হবে ; এইজন্য মেরুঅঞ্চলে বস্তুটির ওজন বিষুবরেখার ওপর বস্তুটির ওজনের চেয়ে বেশী হবে।

(ঞ) যদি কোন উড়োজাহাজ ঘণ্টায় ১০০০ হাজার মাইল বেগে যায়, তাহলে তার শব্দ শোনা যায় না কেন ?

উঃ শব্দের গতি ঘণ্টায় ৪৬০ মাইল ; কোন বস্তু যদি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুতবেগে চলে তাহলে তার কোন আওয়াজ শোনা যাবে না। তাই হাজার মাইল গতিসম্পন্ন উড়োজাহাজের শব্দ শোনা যায় না।

(ট) বিদ্যুতের চমক বজ্রের গর্জন শোনার আগে দেখা যায় কেন ?

উঃ আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুততর বলে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল।

(ঠ) গ্রীষ্মকালে মাটির কুঁজোয় জল রাখলে ঠাণ্ডা হয় কেন ?

উঃ মাটির কলসী বা কুঁজোয় অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এই সকল ছিদ্র দিয়ে জল বেরোয়। গ্রীষ্মকালে বাতাস শুষ্ক থাকে বলে কুঁজোর গায়ের জল বাষ্প হয়ে উত্তাপকে কমিয়ে দেয়। ফলে কুঁজোর জল ঠাণ্ডা হয় এবং ঠাণ্ডা থাকে।

(ড) এরোপ্লেনে ওঠার সময় ফাউণ্টেনপেনের কালি ফেলে দিতে বলা হয় কেন ?

উঃ এরোপ্লেন যখন উঁচুতে ওঠে তখন বাতাস হাল্কা হয়ে বায়ুর চাপ কমে যায়। ফলে ফাউণ্টেনপেনের ভেতরের বাতাসের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং কালি ভেতরের বাতাসের চাপে বেরিয়ে এসে জামা-কাপড় নষ্ট করে দেয়।

(ঢ) পেট্রোলের আগুনে জল ঢাললে নেবে না কেন ?

উঃ পেট্রোলের আগুন এত তীব্র যে জল আগুনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়। ফলে আগুন নেবে না।

(ণ) কোথায় বছরের সব সময় দিনরাত্রি সমান ?

উঃ বিষুবরেখা অঞ্চলে।

(ত) পর্ব্বতের উচ্চে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় কেন ?

উঃ পর্ব্বতের ওপরে বাতাস হাল্কা হয়ে যায়, ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

(থ) মেঘলা রাত্রি পরিষ্কার রাত্রির চেয়ে গরম কেন ?

উঃ মেঘ ভূপৃষ্ঠ বা বাতাস থেকে তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। ফলে মেঘলা রাত্রি পরিষ্কার রাত্রির চেয়ে বেশী গরম হয়।

(দ) চাঁদের একটা দিকই আমরা সব সময় দেখতে পাই কেন ?

উঃ কারণ চাঁদ একই সময় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘোরে (২৭-১/৩ দিন)। ফলে আমরা সব সময় চাঁদের একটা দিকই দেখতে পাই।

খেলাধুলা—

প্রঃ অলিম্পিক কি ?

উঃ খৃষ্টপূর্ব ৭৬৬ অব্দ হইতে ৩৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি চার বৎসর অন্তর গ্রীস দেশের অলিম্পিক নামক স্থানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত। গ্রীক দেবতা থিউসের সম্মানে

এই প্রতিযোগিতা হ'ত। এই প্রতিযোগিতার নাম ছিল অলিম্পিক গেমস। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'অলিম্পিক গেমস' নাম দিয়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় প্রতি চার বছর অন্তর। এই প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশই অংশগ্রহণ করে।

১৯২৮ সাল হ'তে যে সকল জায়গায় 'অলিম্পিক গেমস' অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল:

১৯২৮—আমস্টারডাম্ (নেদারল্যাণ্ড)

১৯৩২—লস এঞ্জেলস্ (মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র)

১৯৩৬—বার্লিন (জার্ম্মাণী)

১৯৪৮—লণ্ডন (যুক্তরাজ্য)

১৯৫২—হেলসিঙ্কি (ফিনল্যাণ্ড)

১৯৫৬—মেলবোর্ণ (অষ্ট্রেলিয়া)

১৯৬০—রোম (ইটালী)

১৯৬৪—টোকিও (জাপান)

১৯৬৮—মেক্সিকো (আমেরিকা)

১৯৭২—মিউনিক্ (পশ্চিম জার্ম্মাণী)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে অলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্রঃ গত মিউনিক্ অলিম্পিকে যে কয়টি দেশ অধিক সংখ্যক পদক পাইয়াছিল তাহাদের নাম ও পদকের সংখ্যা দাও।

উঃ

দেশের নাম	সংখ্যা		
	স্বর্ণপদক	রৌপ্যপদক	ব্রোঞ্জপদক
১। সোভিয়েত ইউনিয়ন	৫০	২৭	২২
২। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৩৩	৩১	৩০
৩। পূর্ব্বজার্মাণী	২০	২৩	২৩
৪। পশ্চিম জার্মাণী	১৩	১১	১৬
৫। জাপান	১৩	৮	৮
৬। অষ্ট্রেলিয়া	৮	৭	২

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীকে স্বর্ণপদক, দ্বিতীয়কে রৌপ্যপদক ও তৃতীয়কে ব্রোঞ্জপদক দেওয়া হয়।

প্রঃ গত অলিম্পিকে ভারতবর্ষ কয়টি পদক পাইয়াছিল ?

উঃ ভারত মাত্র একটি ব্রোঞ্জপদক পাইয়াছিল। হকি খেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার

করে। হকি খেলায় একসময় ভারতবর্ষ বিশ্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত অলিম্পিক হকিতে ভারত বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে হকিতে ভারতের প্রতিযোগী পাকিস্তান, পশ্চিম জার্মাণী।

প্রঃ ম্যারাথন রেস কাকে বলে?

উঃ অতীতকালে গ্রীসদেশে ফিডিপাইডিস নামক একজন সৈনিক ২২ মাইল পথ দৌড়ে ম্যারাথন যুদ্ধ জয়ের খবর গ্রীস দেশে পৌছে দেন। এই খবর পৌছে দিয়েই তিনি মারা যান। এই বীরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ম্যারাথন রেসের প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে এই দৌড়ে ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়।

প্রঃ ভারত কোন কোন খেলায় বিশ্বে সুনাম অর্জ্জন করেছে।

উঃ (ক) ক্রিকেটে আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর যে কোন দেশের সমকক্ষ। শেষ ক্রিকেট টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মত শক্তিশালী দলকে পরাজিত করেছে। এই সিরিজে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন অজিত ওয়াদেকার।

(খ) লন টেনিসেও ভারতবর্ষের স্থান অষ্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। রমানাথ কৃষ্ণণ ও বিজয় অমৃত রাজ টেনিস খেলায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

(গ) হকিতেও ভারতের স্থান প্রথম সারিতে।

(ঘ) বিলিয়ার্ড খেলায়ও ভারত একাধিকবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভারতের উইলসন জোনস বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ছিলেন।

প্রঃ গত মিউনিক্ অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশী পদক কে কে পেয়েছিল?

উঃ (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্ক স্পিজ্। সে একা সাতটি স্বর্ণপদক লাভ করে। অলিম্পিক ইতিহাসে একক কৃতিত্বের ক্ষেত্রে ইহাই রেকর্ড। মার্কস্পিজ সাঁতারে সমস্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল।

(খ) অষ্ট্রেলিয়ার পনের বছরের মেয়ে শেন গোল্ড সাঁতারে একাই তিনটি স্বর্ণপদক দখল করে।

প্রঃ বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্পিনবোলার কে?

উঃ ভারতের চন্দ্রশেখর ও বিষেণ সিং বেদী।

প্রঃ হকির যাদুকর কাহাকে বলা হয়?

উঃ ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হকি খেলেয়াড় ধ্যানচাঁদকে হকির যাদুকর বলা হয়।

প্রঃ ক্রিকেটে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌখস খেলোয়াড় কে?

উঃ ওয়েস্টইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক গ্যারফিল্ড সোবার্স।

প্রঃ ক্রিকেটে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান্ কে?

উঃ অষ্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান্। ইনি ডন ব্রাডম্যান্ নামেই ক্রিকেট জগতে পরিচিত।

প্রঃ প্রথম কোন ভারতীয় দল আই. এফ. এ. শীল্ড লাভ করে?

উঃ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব আই. এফ. এ. শীল্ড লাভ করে।

প্রঃ ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলার উপযোগী শ্রেষ্ঠ মাঠ কোন্‌টি?

উঃ কোলকাতার ইডেন উদ্যান। ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট পীচ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীচ।

প্রঃ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নাম কি?

উঃ রণজিৎ সিংজী, দলীপ সিংজী, পতৌদির নবাব, কর্ণেল সি. কে. নাইডু, বিজয় মার্চ্চেণ্ট, লালা অমরনাথ, বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, মুস্তাক আলী, হিমু অধিকারী, খুঁটে ব্যানার্জ্জী, কার্তিক বসু, পঙ্কজ রায়, সুভাষ গুপ্তে, পলি উমরিগড়, ইত্যাদি।

প্রঃ ফুটবল খেলায় অতীতে যে সকল ভারতীয় খেলোয়াড় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কি?

গোলে :—কে,দত্ত, সঞ্জীব, ভরদ্বাজ, ওসমান, ইসমাইল, থঙ্গরাজ, সনৎ শেঠ, নারায়ণ।

ব্যাকে :—গোষ্ঠ পাল, তাজমহম্মদ, জুম্মা খাঁ, শরৎ দাশ, শৈলেন মান্না, পি, চক্রবর্তী, আমেদ হোসন, আজিজ, লতিফ, জারনেল সিং, চন্দ্রশেখর, অরুণ ঘোষ, টি, এ, রহমান।

হাফ ব্যাকে :—টি, আও, মোহিনী ব্যানার্জী, নুরমহম্মদ, সালাম, ইউসুফ খাঁ, রবি দাস, সুভাষ সর্বাধিকারী, চন্দন সিং, কেম্পিয়া, রাম বাহাদুর, নিখিল নন্দী।

ফরওয়ার্ডে :—শিবদাস ভাদুড়ী, বিজয়দাস ভাদুড়ী, সূর্য চক্রবর্তী, উমাপতি কুমার, করুণা ভট্টাচার্য্য, সামাদ, রসিদ, রহিম, নুরমহম্মদ, সাত্তার, সোমানা, আপ্পারাও, আমেদ, ভেঙ্কটেশ, সালে, মেওয়ালাল, পি, নন্দী, প্রদীপ ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, বলরাম, সমর ব্যানার্জী, পরিমল দে, রুনু গুহঠাকুরতা, নেভিল ডিসুজা, পূরণ বাহাদুর, অরুময়, নঈম।

প্রঃ—খেলাধুলায় আন্তর্জাতিক পুরস্কারগুলির নাম বল।

ক্রিকেট—এ্যাশেস। (অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে দল জেতে সে এ্যাশেস পায়)। ফ্যাঙ্ক ওরেল কাপ। (অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে যে দল জেতে সে পায়)। অন্য দলের মধ্যে টেষ্ট খেলায় বিজয়ী দল রাবার লাভ করে।

ফুটবল—জুলে-রিমে কাপ। (বিশ্ব-ফুটবল) মারডেকা (এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা)।

লন-টেনিস—উইম্বলডন ট্রফি। (ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন-শিপ)। ডেভিস কাপ বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা)।

টেবল-টেনিস—সোয়েদলিং কাপ (পুরুষ)। করবিলিয়ন কাপ (মহিলা)।

ব্যাডমিণ্টন—টমাস কাপ।

প্রঃ—খেলাধুলায় জাতীয় পুরস্কারগুলির নাম কি ?

ক্রিকেট—রণজী ট্রফি, দলীপ ট্রফি, মৈনুদ্দুল্লা গোল্ড কাপ, ইরানী ট্রফি।

ফুটবল—আই. এফ. এ. শীল্ড, ডুরাণ্ড কাপ, রোভার্স কাপ, ডি. সি. এম. ট্রফি সন্তোষ ট্রফি।

হকি—বাইটন কাপ, আগা খান কাপ, বোম্বে গোল্ড কাপ, ধ্যান চাঁদ ট্রফি।

টেবল্-টেনিস—বার্ণা বেলাক কাপ (পুরুষ)। জয়লক্ষ্মী কাপ (মহিলা)।

প্রঃ—মাউণ্ট এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে প্রথম কে আরোহণ করেন ?

উঃ—এডমণ্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগে।

প্রঃ—মহাকাশে কোন প্রথম পুরুষ ও প্রথম মহিলা প্রদক্ষিণ করেন ?

উঃ—পুরুষ-ইউরি গ্যাগারিন (সোভিয়েট রাশিয়া)। মহিলা—ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা (সোভিয়েট রাশিয়া)।

প্রঃ—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম কি ?

উঃ—ভারত—টাকা, আমেরিকা—ডলার, বাংলাদেশ—টাকা, কানাডা—ডলার, পাকিস্তান—টাকা, জার্মানী—মার্ক, জাপান—ইয়েন, ফ্রান্স—ফ্রাঙ্ক, চীন—ইউয়ান, ইংলণ্ড—স্টার্লিং-পাউণ্ড, রাশিয়া—রুবল, ইটালী—লিরা।

॥ আরও কিছু ॥

সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে হলে প্রতিদিন যে কোন একটা খবরের কাগজ ভাল করে পড়া উচিত। তাছাড়া বর্ষপঞ্জী পড়লেও অনেক জিনিষ জানা যায়। শুধু পড়া নয়, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পঠিত বিষয় আলোচনা করা এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তু আয়ত্ত হবে ও মনে থাকবে। মনে রাখা দরকার যে এক দিনেই সব জিনিষ আয়ত্ত হয় না। এর জন্য দীর্ঘ অনুশীলন দরকার হয়। নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করাও একটা সমস্যা। শিক্ষক মহাশয়কে বা কোন বিদ্বান লোককে জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। ইংরেজীতে বিভিন্ন বিষয়ের Encyclopedia আছে। সেখানেও বহু প্রশ্নের উত্তর পাবে। বাংলায় ভারত কোষ, বুক অফ নলেজ, বিশ্ব পরিচয়, বিজ্ঞান কোষ প্রভৃতি বহু বই আছে যেখানে বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এসব বই অত্যন্ত মুল্যবান এবং সকলের পক্ষে কেনাও সম্ভব নয়। ভাল পাঠাগারে এসব বই পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ে আজকাল এত বই বেরিয়েছে যে বই বাছাই করা খুবই শক্ত ব্যাপার। এক বিষয়ের ওপর অনেক বই পড়া খুবই সময় সাপেক্ষ। কোন বই বাছাই করতে হ'লে সেই বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। কারণ তিনি সঠিক নির্দেশ দিতে পারবেন।

বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং

এম. এল. দে য়্যাণ্ড কোং

মূল্য—চার টাকা মাত্র।